আজ ও আগামীকাল

দেবদত্ত রায়

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

জ্ঞান প্রকাশন

২২এ কলেজ রো : কলিকাতা-৯

॥ প্রকাশক ॥
এম. রায়
[illegible]-পরিচয়
কলিকাতা-৩০

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

॥ মুদ্রক ॥
অজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

—কমরেড বিজয় পালকে

এই মাত্র ভোর হল। পূব আকাশে কিছু মেঘ লালচে আভা দিচ্ছে। ক্ষণপরে সূর্য দেখা দেবে। পূব আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু জলহীন এই মেঘ ছাড়া, বাকী আকাশ একদম পরিচ্ছন্ন। স্বভাবতই সারাদিন রোদ আশা করা যায়। অভ্যাস-বশত সুনন্দার ঘুম ভেঙে যায় এ সময়ে প্রায় প্রতিদিনই। মাঝে মধ্যেও বুঝি ব্যতিক্রম নেই। ঘুম থেকে হাঁই ভেঙে একটু ঝুঁকি দিয়ে যখন উঠে বসেন, নিজের অলক্ষ্যেই মুখের সামনে দু আঙুলে তুড়ি মারেন। তারপর বার কয়েক দুর্গানাম। এটাও সুনন্দার নিত্যকার ব্যাপার।

এরপর প্রতিদিনের মতোই তিনি চোখে মুখে জল দিলেন। এক হাতে পেতলের ঘটি অন্য হাতে দড়িসহ বালতী নিয়ে কুয়োতলায়। পাশের বাড়ী থেকে এক খাবল গোবর দিয়ে পাড়ার বারোয়ারী দুর্গামন্দিরে 'মারুলী' দিলেন, প্রণাম করলেন, বাড়ীর প্রবেশ দরজার চৌকাঠে, তুলসীতলায় মারুলী দিলেন এবং সর্বশেষ সারা উঠানে গোবর চ্ছটা দিয়ে হাত ধুলেন। উনুন কাল রাতেই মুক্ত করে রেখেছিলেন, সুতরাং কয়লা ভাঙবার জন্য হাতুড়িটা তুলে নিয়ে একটা ইটের উপর বসতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কড়া নড়ে উঠল। সুনন্দা উঠি উঠি করে হাঁক পেরে প্রশ্ন করেন, কে গো, যাচ্ছি।

সুনন্দা সাড়া পেলেন না! কড়া আবার নড়ে উঠল। এবার আর দেরি না করে সুনন্দা দোরগোড়ে এসে উঁকি মারতেই চমকে উঠলেন। সম্পূর্ণ ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার। আকাশের দিকে চোখ উঁচিয়ে সিগারেট টানছেন। পাশে রাইফেল কাঁধে জনা পাঁচেক সিপাই। সুনন্দাকে দেখে পুলিশ অফিসার নিবারণ মিত্তির চৌকাঠে পা রেখে জিগ্যেস করেন, এটা চারুবাবুর বাড়ী?

সুনন্দা মাথা নাড়েন।

তিনি বাড়ী আছেন?

—হ্যাঁ আছেন, ঘুমুচ্ছেন।

নিবারণ মিত্তির আর কোন কথাই জিগ্যেস করলেন না। একবার পেছন ফিরে সেপাইদের লক্ষ্য করে হাতের রুল এবং চোখ দিয়ে ইশারা করে বললেন, ঢোক, আছেন।

সিপাই কজন এবং মিত্তির নিজে তাদের পেছন পেছন গটগট করে বাড়ীর উঠানে এসে হাজির হন। বিস্মিত সুনন্দা কোন কথা না বলে এক পাশে সরে গিয়ে কাঁপতে থাকেন। সকাল সকাল কি ব্যাপার রে বাবা! সকলে দাওয়ার উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হতবাক সুনন্দাও পা-পা করে উঠানে এসে দাঁড়ান। নিবারণ মিত্তির তখন সিপাইদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তুম উধার, অ্যাইও, ইউ, তুম, উসতরফ-দারোয়াজামে। নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে আরও একবার দেখে নিলেন ঠিক ঠিক দাঁড়িয়েছে কিনা। তারপর সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়ে গটগট করে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং উঠানে সুনন্দার দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, এই ঘরে?

সুনন্দা মাথা নাড়েন।

গোলমালে ততক্ষণে চারুবাবু জেগে উঠেছেন। চোখ কচলে বাইরে বেরিয়ে এসে সামনে এই অবস্থা দেখে বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন।

নিবারণ মিত্তির প্রশ্ন করেন, আপনি চারু বসু?

চারুবাবু মাথা নাড়েন।

—চলুন আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।

—কেন?

—কেন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় না। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। ইউ আর ওয়াণ্টেড পারসন্। চলুন!

চারুবাবু অসহায় ভাবে একবার উঠানে দাঁড়ানো স্ত্রীর দিকে,

একবার নিজের পরণের লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করেন। পুলিশ অফিসার বাঁধা দেন, উহুঁ কাপড় পালটাবার দরকার নেই। ওতেই হবে।

চারুবাবু তবু ইতস্তত: করছেন দেখে এবার একটু উষ্ণ হয়ে ওঠেন নিবারণ মিত্তির, দাঁড়িয়ে কেন? যা বলছি তাই করুন।

এরপর চারুবাবু কোন কথাই বললেন না। এক পা দু পা করে এগুতে লাগলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই নাটকের দৃশ্যটি অভিনীত হয়ে গেল। রেশ কেটে গেলে সুনন্দা দাওয়ায় বসে পড়লেন ধপ করে। বাইরে যারা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল সকলেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। দেখতে দেখতে নামোপাড়ার আর কেউ বাকী রইল না। বুড়োবুড়ি ছেলেপুলে মেয়ে বৌ আণ্ডাবাচ্চা সে এক এলাহী কারখানা। সকলেই জানতে চান ব্যাপারটা কি? নিমেষের মধ্যে বাড়ী ভরতি হয়ে গেল।

ফায়ারম্যান অমূল্য ভট্চাজ এলেন। নামো পাড়ার প্রায় শেষ মাথায় বড় আমগাছটার পাশে ধোবী-শাউর ভাড়া বাড়ীর চকোর্ত্তী এল, ভটচাজ গিন্নী, নকুল দোষাদ, মান্নু শেখ। আর ছেলেদের মধ্যে এলো তোতন, নেপাল, নন্তু, তোতলা দাসু। এমন কি নামো পাড়া আর উপর পাড়ার মাঝামাঝি সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে কাঁদু খুড়িমা লাঠিতে ভর দিয়ে ঠকঠক করে এসে উপস্থিত, এসেই জিজ্ঞাসা, কি হলো চারুর? ওকে নাকি পুলিশ ধরেছে?

কে একজন উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ভীড়ের মধ্যেই লাঠিটা পেতে তার উপর বসে পড়ে গাল দিয়ে ওঠেন নিব্বংশের বেটা তোদের কুঠে ধরেনা? লোকটা সাতে নেই পাঁচে নেই, এই সাত সকলা ধরে নে গেলি? ঘরে তুদের মাগ-বৌ নাইরে হার-হাভাতির বাচ্চারা?

কাঁদু খুড়ি, পাড়ায় তার বচনের জন্যেই বিখ্যাত। কিন্তু সঠিক কথাটা বলতে তিনি কসুর করেন না।

না আসার মধ্যে নরেশ উকিল। দয়াল শা'র বন্ধু লোক। উপর পাড়ার ফাঁকা মাঠটার পেল্লাই বাড়ীটা ওদের! না এলো নরেশ উকিল, না এলো ওর মেয়ে রেণু।

আর ছেলেটার কথা তো ধরার মধ্যেই নয়। সর্বদাই এর পেছনে নয়তো ওর পেছনে। পাড়ার মেয়েরা ওকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাবের মধ্যে পাড়ায় কেবল মোটকা মুদির সঙ্গে। ওদের লেনদেন আছে তাই।

ওরা অবশ্য এ পাড়ার কোন কিছুতেই থাকে না। তবু পাড়া-প্রতিবেশী হিসেবে বিপদের দিনে সবাই আশা করে।

সুনন্দা সেই থেকে তেমনি ভাবেই নিশ্চুপ দাওয়ায় বসে। বড় ছেলে দিগেন লোকোতে ফিটার। পাড়ার ইউনিট সেক্রেটারী। নাইট সিফটের কাজ সেরে আটটায় পৌঁছবে। মেঝ মেয়ে দীপুও কিছু বুঝতে না পেরে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। এমনিতেই মেয়েটা গম্ভীর ধরনের। তার ওপর ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি। শুধু ছোট ছেলে শিবু এতক্ষণ মায়ের গা ঘেঁষে বসে অবাক বিস্ময়ে সব দেখছিল এবং সকলের মন্তব্যগুলো লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মায়ের ডান হাতের খালি কব্জির উপর আলতোভাবে হাত রেখে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, দাদাকে ডেকে আনবো মা?

সম্ভবত পাশে দাঁড়ানো চক্কোত্তির কানে গেছে কথাটা। পেয়ারার ডাল দিয়ে দাঁতুন করছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, না, তোকে যেতে হবে না, আমি ডেকে দিচ্ছি। সুরেন, বিশু তোমরা পরন্তু একবার থানায় যাও।

অমুল্য ভট্টাচার্য উবু হয়ে বসেছিলেন, তিনি আড়ামুড়ি ভেঙে উঠে দাঁড়ান, থানায় এখন একজন, দুজন যাওয়া কি ঠিক হবে? কার্তিক সেদিন ডাইরী করতে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে ওকেই আটকে

দিয়েছে। দু-একজনে গিয়ে কিস্সু হবে না। তার চেয়ে সুদীপ্তকে খবর দাও। ও আসুক, তারপর যা হয় করা যাবে।

অমূল্য ভট্টচার্যের সর্বশেষ পরামর্শটা যেন সকলেরই ভালো লাগলো। এর মধ্যে জটলা অনেকটা কমেছে। খুব কাছাকাছি কয়েকজন ছাড়া হাতের কাজ সারতে সবাই ফিরে গেছে। সকলের বাড়ীতে সকাল থেকেই তো যত রাজ্যের সব কাজ,—নাকি ?

চক্কোত্তিও অমূল্য ভট্টচার্যকে সমর্থন করে বলে, সেই ভালো, সেনকেই খবর দাও, আমি লোকোতে যাই। দিগেনকে খবর দিই। আপনি উঠুন বৌঠান, বসে থাকলে চলবে ? আমরা এদিকটা দেখছি।

সুনন্দা কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ান। ভট্টচাজ গিন্নী কোন কথা বলেন না। রান্নাঘরে ঢুকে কলসী বার করে জল আনতে চলে যান। সুনন্দা তোলা উনুনটি উঠানের একধারে এনে ধরাবার ব্যবস্থা করেন। চারুবাবুর বৃদ্ধ পিতা লাঠিতে ভর দিয়ে চৌকাঠে এসে দাঁড়ান। বাইরের দিকে তাকিয়ে, দীপুকে জিগ্যেস করেন, কি হয়েছে ?

দীপু ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদুকে হাত ধরে দাওয়ায় এনে বসিয়ে দেয়, বাবাকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। তুমি এখানে বসো।

আনন্দবাবু চোখের নজর না হারালেও কানে কম শোনেন, দীপুর দিকে তাকিয়ে আবার জিগ্যেস করেন, কোথায় গেছে ?

দীপু একটু উচ্চস্বরে বলে, কোথাও যায়নি, থানায় নিয়ে গিয়েছে।

—থানায় ?

—হ্যাঁ !

—কেন ? আমাদের সময়ে তো এত থানাপুলিশ ছিলনা ! কেন নিয়ে গেল ?

—জানিনে।

ও! বলে আনন্দবাবু দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেওয়ালে পিঠের কুঁজ ঠেসিয়ে বসে দীপুকে জিগ্যেস করেন, চা হয়নি?

—না। তুমি একটু বসো দাদু! একটু পরে চা দিচ্ছি। বাবাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে উনুনে আঁচ দেওয়া হয়নি এখনও।

আনন্দবাবু বিরক্তি প্রকাশ করেন, ও কি করলো আবার, ওকে থানায় নিয়ে যাবার কি হলো? কি যে করে সব আজকাল?

দীপু কাঁসার ঘটিতে এক ঘটি জল দাদুর কাছে নামিয়ে শিবুকে লক্ষ্য করে বলে, দাদুর মুখটা ধুইয়ে দে ভাই।

শিবু দিদির কথা মতো দাদুর মুখ ধুতে সাহায্য করতে উঠে আসে। দীপু আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে বাসন মাজতে বসে যায়। ভাগ্যিস পুলিশগুলো ঘরে ঢোকেনি, নইলে আবার সব ধোয়া মোছা করতে হতো। সুনন্দা হাতল ভাঙা তালপাতার হাত পাখাটা দিয়ে উনুনে হাওয়া দিতে থাকেন। সকাল থেকে সেই যে মুখ বন্ধ করেছেন, একটা কথাও এর পর বলেন নি। এমন কি অমূল্য ভট্চাজ, চক্কোত্তির পর্যন্ত কোন প্রশ্নের জবাব দেননি।

ভট্চাজ গিন্নি জলের কলসীটা নামিয়ে রেখে সুনন্দাকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি দিদি অমন চুপ হয়ে গেলে কেনো? অত ভয়ের আছেটা কি? থানায় নিয়ে গেছে বেশ করেছে। চুরি করে তো আর যায়নি? কি ব্যাপার, ওরা ঘুরে আসুক! ভুলও তো হতে পারে। নাও, উঠে সব গোছগাছ করে নাও, তুমি অমন করলে বাচ্চাগুলো আরও বেশী ভয় পেয়ে যাবে।

সুনন্দা তেমনি যন্ত্রের মতো উনুনে হাওয়া দিতে দিতে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। ভট্চাজ গিন্নি বুঝতেই পারেন না ওর কথাগুলো সুনন্দার কানে গেল কি গেল না। সম্ভবতঃ ভট্চাজ গিন্নি আরও বার দুই তিন কথা বলাবার চেষ্টা করেছিলেন, তারপর এক সময়ে নিজের সংসারের কাজ দেখার জন্যে উঠে এসেছিলেন। সমবেদনা,

মমতাবোধ এদের সকলেরই আছে কিন্তু, সেই সঙ্গে নিজেদের সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদেরই দেখতে হয়। স্বভাবতই, ফাঁকা থাকলে আরও কিছুক্ষণ এদের সঙ্গে থেকে এইক্ষণের এমন একটা বিশ্রী ঘটনার আঘাতটাকে হালকা করার মতো ইচ্ছে থাকলেও পেরে ওঠে না। বাড়ী এক সময়ে একেবারেই ফাঁকা হয়ে যায়।

এতক্ষণে সুনন্দার আবার মনে হয়, ঘটনা যা ঘটবার ঘটেছে, সত্যি বসে থেকেও কিছু একটা সুরাহা করতে পারবে না। অথচ কাজকর্মগুলো জমে যাচ্ছে। এমনতো হতে পারে এক্ষুণি উনি ফিরে আসবেন, এবং স্বাভাবিক ভাবেই ডিউটি যাওয়ার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকবেন। বসে থাকলেই তো বিপদ, অতএব সুনন্দা নিজেই মেয়ের দিকে লক্ষ্য করে ডাকেন, তোর হলো দীপু? একটু হাত চালাও। তারপর গিয়ে পড়তে বসো।

যেমন সবই স্বাভাবিক। কিচ্ছুটি হয়নি।

দীপু নিজের কাজ যথাযথই করে চলে। মুখে বলে, হ্যাঁ মা আর একটু হলেই হলো। ভাই দাদুর মুখ ধুয়ে দিলি?

শিবু ততক্ষণে মানচিত্রের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর মনোযোগ সহকারে উত্তর ভিয়েৎনাম খুঁজছে। দীপুর কথার কোন জবাব না দিয়ে, দীপুকে হেঁকেই বলে, তোর ম্যাপ বইটা পুরনো দিদি, ওতে সব পাওয়া যায় না। দাদাকে বলবি একটা নতুন বই এনে দিতে।

কেন তুমি বলতে পারবে না?

—পারবনা কেন? আমার সঙ্গে দেখা হয় কখন? তোদের ম্যাপে উত্তর ভিয়েৎনাম ছিল না?

—থাকবে না কেন? এখনও আছে, ভালো করে চেয়ে দেখ। নতুন ম্যাপে রঙ বদলেছে। এখনতো স্বাধীন রাষ্ট্র।

—ও হ্যাঁ, পেয়েছি। এই তো, উত্তর আর দক্ষিণ একই সঙ্গে রয়েছে।

এবং খুঁজে পাওয়ার পর ভূগোল বই-এর পড়ার ভেতর আবার মনঃসংযোগ করে। পড়তে পড়তে এক সময়ে মাকে লক্ষ্য করে বলে, মা তোমার উনুন ধরলো? দাদু চা, চা করছে শুধু।

সুনন্দা কোন জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করেন, দাদুর কি? সময় অসময় নেই। কেবল খাই খাই। কি যে হয়ে গেল, কি যে হয়ে যাচ্ছে তার কোন চান্দা আছে? শুধু এটা দে ওটা দে। পরক্ষণে উনুনে কেটলী চাপাতে চাপাতে বলেন, চা চাপিয়েছি। দিচ্ছি বলো, একটু সবুর সয় না!

দীপু বাসন-কোসন সব গুছিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে রেখে হাতমুখ ধুয়ে বইখাতা নিয়ে শিবুর পাশেই এসে বসে। একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স উবুর করে পাতা। আর একটা প্যাকিং বাক্স দিয়ে তাকের কাজ করা। খবরের কাগজ এঁটে, তার উপর পরিষ্কার সাদা কাগজ দিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। রাতের হ্যারিক্যানটা এখনও বাক্সের উপর রাখা। অন্যদিন ঘুম থেকে উঠে বেরুবার সময়েই ওটা এনে বাইরে একধারে ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু আজ আর হয়ে ওঠেনি। পড়তে বসেই আর উঠতে ইচ্ছে করে না। কাজেই হ্যারিকেনটা পাশেই নাবিয়ে রাখে। দর্শনের ছাত্রী দীপু। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার পর এই বছর পার্টওয়ান ফাইন্যাল দেবে। বয়সের তুলনায় চেহারাটা সত্যিই গম্ভীর ধরনের। মনে হয় মায়ের ছাঁচ ওটা। সুনন্দার চেহারার মধ্যেও সৌম্য অথচ গাম্ভীর্যের আদল। দীপুর চেহারাতে গাম্ভীর্য থাকলেও বেমানান মনে হয় না বা পাকা পাকা মনে হয়না। উপরন্তু শ্যামলা রঙের সঙ্গে এই গাম্ভীর্যের কোথাও যেন একটা প্রচ্ছন্ন মিল রয়েছে। আবার ঠিক এর উল্টো ওর দাদা দিগেন। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ভরপুর দেহের সর্বত্রই একটা জীবন যেন উছলে পড়ছে। যেমন হাতের কব্জি তেমনি বুকের পাটা। শক্ত করে হাতুড়ির বাঁট যখন চেপে ধরে তখন দূর থেকে মনে হবে ওই রকম হাত ছাড়া অমন দৃঢ়ভাবে

কেউই বুঝি হাতুড়িটা ধরে রাখতে পারবে না। ও হাত থেকে কোনদিনই হাতুড়ি ফসকাবার নয়। লোকোর মেইনট্যানেণ্টস বিভাগের ফিটার। ম্যাট্রিক পাস করে সে বছরেই এপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিল। বাউণ্ড এপ্রেন্টিস। পাঁচ বছরের পর ফিটারে প্রমোশন। পাড়ার যেমন ইউনিট সেক্রেটারী, এখানে শেড কমিটির সেক্রেটারী। গ্রেডটু'র জন্যে দুবার পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু দুবারই ভাল পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও অনুপযুক্ত। নিয়ম আছে একদিকে যেমন পূর্ববর্তিতা, অন্যদিকে উপযুক্ততা এই দুই মিলিয়ে প্রমোশন। কিন্তু দিগেনের পূর্ববর্তিতা থাকলেও উপযুক্ততা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে। কিছুতেই আর সেইখানটা উতরোতে পারলোনা ও।

দিগেনের শেড এফ আই. সি. ডিগনাম সাব। দিগেনের কাজে উনি কিন্তু ভীষণ খুশি। এমন কি একটা ভয়ানক দুর্বলতা পর্যন্ত আছে ওর প্রতি। দু-একটা ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা দু-একদিন অনুপস্থিতি পর্যন্ত ধমকে ধমকে মেনে নেন। তিনিই শেষের বার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, তুমকো হোগা নেই ম্যান। যবতক তুম লিডরী নেই ছোড়েগা তবতক তুমকো প্রমোশন নেই দেগা উনলোক। সমঝা ?

দিগেন কি বোঝেনি ? সেও বুঝেছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই চক্রান্ত ওকে হতাশ করতে পারেনি ! উপরন্তু ভেতরে ভেতরে আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে আইনের এক-একটা ফাঁককে এক-একটা ঘুসি দিয়ে ভেঙে ফেলতে। টেবিলে বসে এক হাত মুঠি করে অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। পর দিন সারা শেডে পোস্টার পড়েছে ডি. এম. ই-র বেইমানী নেই চলেগা। কিন্তু এর বেশী এগোয়নি। উপরন্তু অন্য ওর যারা সহকর্মী, যারা প্রমোশন পেয়েছে, ওরা যাতে বিরূপ না হয়, ওদের মধ্যে যাতে বিভেদ আসতে না পারে—ওদের কাছে গিয়েছে, বুঝিয়েছে, বলেছে যা হয়েছে, হয়েছে ; কিন্তু এখনও সবাইকে এককাট্টা হয়েই

লড়তে হবে। ওরা যেন এই আন্দোলনকে ভুল না বোঝে, ইত্যাদি।

সহকর্মীরা খুশি হয়েছে। ভেতরে সামান্য দোদুল্যমানতা যা ছিল কেটে গেছে।

সেই দিগেনের সঙ্গে দীপুর পার্থক্য অনেক। পাশাপাশি দাঁড়ালে একজনকে মনে হবে কাবেরীর মতো স্নিগ্ধপ্রবহা। অনন্ত কাল ধরে শুধু বয়েই চলেছে। কোন ঝড়, কোন বিপর্যয়ই তাকে পরিবর্তিত করতে পারবেনা। অন্যদিকে দিগেন যেন জীবন্ত ছটফট। সর্বদাই আকাশ ছিঁড়ে বেড়াচ্ছে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দামাল ছেলের মতো যেখান দিয়ে যাবে তার ছাপ থেকে যাবে। অথচ হওয়ার কথা বিপরীত। কিন্তু এক যায়গায় দুজনেই সমান। সে ওদের একজনের প্রতি অন্য জনের টান! যেন সেতারের এক তারে বাঁধা। টায় টায় সমান।

পড়তে বসলেও দীপু ভাবছিল, দাদার কথা। অন্য দিনের চেয়ে দাদা যেন দেরি করছে ফিরতে। ঠিক মাথার উপরেই জাফরি কাটা জানালা। পুরনো শাড়ী-ছেঁড়ার উপর কিছু হাতের নকশা দিয়ে তৈরী পর্দা সর্বদাই ঝুলছে! ওটা সরিয়ে পাশের বাড়ীর সদরের ঘরে যেখানে মাষ্টার মশাই বসেন তার মাথার উপরেই দেওয়াল ঘড়িটা দেখা যায় স্পষ্ট। আটটা বেজে গেছে কখন। অন্যদিন এর মধ্যে এসে যায় দাদা। দেরি হচ্ছে কেন, অথচ এবং নিশ্চয়ই এর মধ্যে দাদা খবর পেয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে শান্ত মেয়েটা। একটু উদ্বিগ্ন। নিজের অজান্তেই বই খোলে আর বন্ধ করে। শিবু লক্ষ্য করে। আরও দু-চারবার এই অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করে শিবু বলে, দিদি পড়ছিস না, ভাবছিস?

—হুঁ! না, পড়ছি। এই ভাবছিলাম আর কি, দেখতো উঠে দাদা এলো নাকি?

—দেখতে হবে কেন? দাদা এলে টের পেতি না? আসেনি।

শিবু বললেও উঠে কিন্তু আসে। দরজার বাইরেটা ও দেখে আসে। রান্নাঘরে একবার উঁকিমারে। মা কি করছেন লক্ষ্য করে। দাওয়ায় দাদুর রুটির বাটিতে গোটা দুই কালো ডোরা পিঁপড়ে। আঙুল দিয়ে সরিয়ে ঝুঁকে চোখ দুটোর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারে দাদু রুটি মুখে নিয়ে চিবুলেও, আসলে ঝিমুচ্ছেন। হাসি পেয়ে যায় ওর। মায়ের কাছে ফিরে এসে বলে, ওই দেখ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাচ্ছে।

অন্যদিন হলে সুনন্দা এটা উপভোগ করতেন। হয়ত মন্তব্যও। কিন্তু আজ আর কিছুই ভাল লাগছিলনা শিবুকে ধমকে উঠলেন, পড়াশোনা ছেড়ে ওই কর। বসেছিলে একটু, আরও একটু বসগে।

শিবুর মুখটা চুপসে যায়। দাঁড়িয়ে থেকে মাকে লক্ষ্য করে স্থির দৃষ্টিতে। তারপর ধীরে ধীরে দিদির কাছে আসে। দীপু তখনও বই নিয়ে তেমনি নাড়াচাড়াই করছে। আসলে বেলা যত বাড়ছে, দাদার ফিরতে যত দেরি হচ্ছে দীপু তত ভেতরে ভেতরে নানা শঙ্কা বোধ করছে। এটা ও বুঝে উঠতে পারেনা, প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, কিছু ভাবলেই বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে, নাই'এর ঠিক নিচে কেমন একটা প্যাঁচানো ভাব। অনেক সময় পা কাঁপে। শিবুকে দেখেও কিছু বলেনা তেমনি তাকিয়ে থাকে। শিবু কিছু না বলে ওর পড়ার বই খোঁজে।

সুনন্দা কিন্তু আলুর খোসা ছাড়ালেও এর মধ্যেই দু-দুবার বটিতে ওর আঙুল লেগে গেছে। এটা অন্যমনস্কতার দরুন। সত্যি, কি বিচ্ছিরি ব্যাপারটাই না ঘটে গেল। সাতে নেই, পাঁচে নেই। অফিস, বাজার, রেশন, তাস এই তো সারা দিনরাতের কাজ। কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই, থাকেন না। সকালে কার মুখ দেখেই বা আজ উঠেছিলেন? কে এই বিপদে ফেললো, কত কথাই না তার মনে পড়ছে। এই বিপদে কেবল উকিল বাবুরাই কেউ

আসেনি। এমন কি উঁকি মেরে একবারের জন্যে দেখেও যায়নি। তবে কি তাদেরই কাজ! কিন্তু কেন একাজ করতে যাবেন! তাদের কোন্ বাড়াভাতে ছাই দিতে গেছেন শুনি! তবে, কিসের জন্যেই বা হতে পারে? কারবারের পয়সা-টয়সা! না না, তা কিছুতেই হতে পারেনা। তিনি তা ভাঙতে পারেন না। বয়সেই করলেন না। করলে তো আর এই অবস্থা হতো না। বিয়ের পর থেকে এই উনত্রিশ বছর শেষ হলো, সুদিনের মুখতো আর দেখেন নি। প্রতিদিনের রুটিন করা কাজের কোন নড়চড় হয়েছে কি? ঘুম থেকে উঠে সেই রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকেই রাতে শোবার ঘর। ছেলেরা কতবার বলেছে, মা একদিন হলেও একটু রেষ্ট নাও। রেষ্ট আবার কি! অত ইংরেজী বোঝেনা সুনন্দা। দিগেনই বাংলা করে বলেছে, জিরোও বাবা জিরোও!

—জিরানো! কাজ করবে কে? কোন দশটা ঝি-চাকর, তোমার বাবা রেখে দিয়েছেন? অসুখ-বিসুখ হলেই নিস্তার নেই। আর এখন তো বলে, ঠাকুর দিলে, ভালই। না সুনন্দার জীবনে আয়েস আনতে পারেননি চারুবাবু। সীমিত আয় চারুবাবুর তেত্রিশ বছরের চাকুরীতে কেটে কুটে দেড়শ টাকা মাইনে। লজেন্স কারখানার হিসেব লেখেন। যখন ঢুকেছিলেন, তখন সেই লজেন্স কারখানা একটা ভাঙা টিনের ছাপরায় ছিল। এখন সেই টিনের ছাপরা পাকা হয়েছে। হ্যাজাক থেকে বিজলী বাতি হয়েছে। লজেন্স কারখানার মালিকের ছেলে মটরের কারখানার ইঞ্জিনিয়ার। চারুবাবু একান্ন টাকায় ঢুকেছিলেন এখন একশ একাশি টাকা। কাটাকুটি করে হাতে কুল্যে দেড়শ। চারুবাবু বলেন, হোকনা বাবুর বাড়বাড়ন্ত, আমার তাতে লোকসান কি? বাবুর হলেই তো আমার হবে, অন্ততঃ তোমাদের মুখে চাড্‌ডি ঠিক সময় মতো দিয়ে যেতে পারবো। এই তো মানুষটা! এ মানুষ কি এমন করতে পারে যে থানা-পুলিশ হয়ে গেল। কখন ছাড়বে

কে জানে বাবা। ছাড়বে কি? ছাড়বে বলে ভাত রাঁধতে তো বসে গেল। ভাততো, স্কুলের বেলাতেও চাই! সবই হোল, না হয় সবই বাদ দিলাম, কিন্তু দিগেন ছোঁড়াটারই বা কি এমন আক্কেল? বলি ছুটি কি হয়নি নাকি? তবে? এলে তো তবু একটু সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

দীপু ছুটে এলো! নির্ঘাত যা ভেবেছে তাই। ডাল বসিয়ে মা কুটনা কুটছেন, ডাল যে পুড়ছে খেয়ালই নেই। ও ঘর থেকে গন্ধ পেয়ে ছুটে এসে খপ করে ডালের কড়াইটা নামাতেই সুনন্দার চেতনা হয়।

যা-বাববা। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন সুনন্দা। সবই কি অলুক্ষণে ব্যাপার আজ! দীপু বুঝতে পারে ব্যাপারটা। মাকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি ওঘরে যাও, আমি না হয় করে ফেলি।

—নারে বাপু, অত করতে হবেনা। একটু লেগে গেছে, ঠিক করে নিচ্ছি, তুই যা। কটা বাজলো বল দিকি? স্কুলে যাওয়ার আগে হবেতো? আচ্ছা খোকার কেমন আক্কেল বলতো! বাড়ীতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে তো আজ নাকি? অন্যদিনও যা আজও তাই।

—দাদা হয়তো ওদিকেই গেছে মা।

—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। কিন্তু খবর তো একটা দেবে নাকি? ভাবনার উপর ভাবনা। দীপু ভূঁয়েই চেপে বসে কাপড় গুটিয়ে, বেশি ভেবে আর কি হবে মা। দাও ডাঁটা ক'টা কেটে দিই। তুমি ওদিকটা দেখো।

সুনন্দা ডাঁটা সমেত বঁটিটা দীপুর দিকে ঠেলে দিলেন। নিজে উঠে এলেন, একটু পোস্ত বেটে নিতে হবে। একটু জিরে-ধনে।

কাজতো শুধু আর রান্না আর খাওয়াই নয়। এর পরই আবার আছেনা, শ্বশুরের বিছানা কেচে রোদে দিতে হবে। শিবু বড় হওয়ার পর কাঁথা কাচার ব্যাপার বছর খানেক বন্ধ ছিল। তারপর

আবার শ্বশুর নিজেই! প্রতিদিনই রাতে বিছানা ভেজাবেন। কে করবে আর সুনন্দা ছাড়া। কপালে লিখে দেওয়া আছে, খণ্ডাবে কে? সব সুদে-আসলে শোধ করে দিয়ে তবে ওর মুক্তি। ছেলের গোঁ, বিয়ে করবেনা আরও তিন বছর। বৌ এলে না হয় কিছু সুরাহা ছিল। অবশ্য এখন মেয়ে মাঝে মাঝে সাহায্য করে। কিন্তু ওরও হলো পাসের পড়া। বেশি হাত দিতে দেন না। তবু কি আর টুকিটাকি নাড়াচাড়া করেনা? করে, কিন্তু তা আর কতটুকু। সবচেয়ে অসুবিধে হল গিয়ে শ্বশুরের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার যোগান। কি যে হয়েছে খাই খাই। হাত খালি হবার জো নেই, অমনি মা, অ-মা খেতে দাও।

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই সুনন্দার ভাবনায় ছেদ পড়ে। চোখ তুলে সটান সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পান, দিগেন আর সুদীপ্ত ঢুকছে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বিমর্ষ, চিন্তিত। সুদীপ্তের মুখেও কেমন একটু ভাবনার ছাপ!

মায়ের চোখে চোখ পড়লেও দিগেন অন্য দিনের মতো কোন কথা না বলে, সোজা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। সুদীপ্তও তাকে অনুসরণ করে। শুধু সুনন্দাকে যান্ত্রিক ভাবে প্রশ্ন করে—মাসিমা ভাল আছেন কিনা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করেনা।

এটা ব্যতিক্রম। স্বভাবতই সুনন্দা প্রথমে ছেলে এবং সুদীপ্তকে দেখে যেমন হালকা ভাব অনুভব করেছিলেন, এইক্ষণে ভেতরে ভেতরে পুরনো সেই দমআঁটা চাপ চাপ উদ্বেগ ভাবটা আরও বেশী করে চাপ দিতে থাকে। অস্বস্তিতে কোন রকমে হাতে জল ঢেলে আঁচলে দুহাত মুছতে মুছতে পায়ে পায়ে এসে ছেলের কাছে দাঁড়ান।

দিগেন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, মা দু কাপ চা করে দাওনা। কি চাপিয়েছ? অসুবিধে হবে না তো?

—না, দিচ্ছি।

সম্ভবতঃ সুনন্দা বুঝতে পারেন কিছু এমন আলোচনা যা তার সামনে করতে চায়না। কারণ শিবু এবং দীপু দুজনকেই ঘরে ঢুকেই কাদের কাদের ডাকতে পাঠাল তা লক্ষ্য করেছেন তিনি। সুনন্দার জিজ্ঞেস করার থাকলেও কোন কথা না বলে চা করবার জন্যে পা বাড়িয়েই জিজ্ঞেস করেন, সঙ্গে কিছু পাঠাব? রুটি আছে, মুড়িও আছে।

—না! ক্যান্টিনে খেয়েছি, তুমি শুধু চা দাও।

সুনন্দা চলে যেতেই দিগেন সুদীপ্তকে লক্ষ্য করে বলে, শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলি বল?

সুদীপ্ত নিঝুম বসে থেকে যেমন ভাবে সিগারেট টানছিল এবং আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিল তেমনি ভাবেই আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে থাকল। কিছুক্ষণ এই ভাবে চুপচাপ থাকার পর পা বদল করে, ডান পায়ের উপর বাঁ পা চাপিয়ে আবার চেপে বসে।

দিগেন তাড়া দেয়, কি অত ভাবছিস বল, বিপিনদা যা বললেন, আমি তার সঙ্গে একমত। দু-একজন না গিয়ে পাড়ার সকলকে নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে যাওয়াই ভাল।

সুদীপ্ত এবার নড়ে ওঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ বিপিনদা তো বলেই খালাস কিন্তু ঝুঁকিটাতো নিতে হবে আমাকেই। তাই ভাবছি। ধর দল বেঁধে গেলাম, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। মিত্তিরকে তো চিনিস। বেটাকে যদি কনভিন্স করা যায় তো কাজ হলেও হতে পারে।

কিন্তু সুদীপ্ত, এটা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা, ওরা গায়ের জোরে যা হোক কিছু করবে, আর আমরা করজোড়ে তাদের কাছে বারবার গিয়ে দাঁড়াবো, এটা কি ব্যাপার? ওতে তো ওদের ব্যাপরোয়া হয়ে ওঠার পক্ষে আরও সাহায্য করা হচ্ছে। হচ্ছে নাকি?

সুদীপ্ত হাসে। দিগেনের চওড়া বুক আর ইস্পাতদৃঢ় বাহু

দুটোর দিকে একবার তাকায়, তারপর ভাবের ঘোরেই যেন বলে, তোর মতো যদি ভাবতে পারতাম আর হুটপাট করে যা হোক করে ফেলতে পারতাম হয়তো তাতে ভালই হতো। কিন্তু আমাকে পা ফেলতে হয় অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে। যাই হোক এসব নিয়ে এক্ষুণি বিস্তারিত আলোচনা করে লাভ নেই। কি করা যায় তাই দেখা যাক। আমার মনে হয় নিজেরা একবার গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি? শুধু শুধু পাড়ার মানুষগুলোকে জড়িয়ে লাভ নেই। তাতে পরে ক্ষতি হতে পারে।

দিগেনের মনে একটু ইতস্তত: ভাব দেখা দেয় সুদীপ্তের কথায়। কেবল মশায় মশায় করা, এটাই বা কেমন বাবা। তার চেয়ে ঝুঁকি নিতে হয় নিতে হবে। অথচ আজকের ব্যাপারটায় দিগেন বেশী জোর দিতে পারছেনা তার এক কারণ এখানে তার বাবার প্রশ্ন জড়িত। যদি অন্যের ব্যাপার হতো তা হলে কিছুতেই সুদীপ্তের কথা মেনে নিতে রাজী হতো না। এই সব ব্যাপারে এত ভয় করলে চলবে কেন? লোকো শেড থেকে বেরিয়ে আঞ্চলিক অফিসে যখন এসে পৌঁছেছিল, সেখানেই সুদীপ্তকে পেয়ে যায়। সুদীপ্ত অমূল্য ভট্চাজের কাছে আগেই খবর পেয়েছিল। লোকো শেডে দিগেনকে খবর দিতে গিয়ে অমূল্য ভট্চাজই সে কথা জানিয়ে ছিল। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন না। স্বভাবতই আরও দু-একজন সিনিয়র কমরেড যারা ছিলেন তারা বিষয়টা নিয়ে বসে চিন্তা করেন। থানায় শঙ্করদা একবার ফোনও করেছিলেন কিন্তু কোন কিছুই সঠিক বলতে পারলেন না থানা কর্তৃপক্ষ। নিজেরা ইতি কর্তব্য ঠিক করতে না পারলেও সুদীপ্ত এবং দিগেনকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হলো, এখুনি ওরা এলাকায় চলে যাক, সেখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে আশে পাশের দু-একটা ইউনিটের সঙ্গে বসে নিতে পারে। সারাটা পথ উভয়ের মধ্যেই এই মুহূর্তের পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক হয়। নির্দিষ্ট কোন

পথই বার করতে পারে না। দিগেনের মতে এখুনি দলবল নিয়ে যাওয়াই ঠিক, সুদীপ্ত পিছু টানে, উহুঁ, আলোচনা-অনুরোধ ব্যর্থ হলে তখন ওই পথে।

শুধু চা বললেও, সুনন্দা কিছুক্ষণের মধ্যে এনামেলের দুটি বাটিতে তেল মাখানো মুড়ি এবং চা নিয়ে আসেন, টেবিলের উপর রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করেন, খোকা ওর ব্যাপারে কিছু খবর পেলি।

দিগেন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, আমরা দেখছি মা, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি এঁসব নিয়ে বেশী ভেবোনা।

সুনন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, না আমি ভাবছিনা, ভেবেই আর কি করব? ভাবছি মানুষটা কি এমন করতে পারে যে ঘুম থেকে তুলে থানায় নিয়ে যেতে হবে?

সুদীপ্ত সহানুভূতির সুরে বলে, এদের কাজের কোন যুক্তিতর্ক নেই মাসীমা। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করে থৈ পাবেন না। আমরা সকলেই দেখছি।

—ছাখো তোমরা, বলেই আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন।

অমূল্য ভট্‌চাজ, চক্কোত্তি, বড়দা, নেপাল, তারু এবং নন্তুকে খবর দেওয়া হয়েছিল। একদিকে শিবু এবং অন্যদিকে দীপু দুজনেই দ্রুত খবর দিয়েছিল। কেউ কেউ কাজে গেছে, কেউ কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এইক্ষণে যাদের পাওয়া গেছে, খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কেউ কেউ কিছু আগে পরে, দিগেনদের বাড়ীতে জমা হয়।

সুদীপ্ত সরে সকলকে বসাবার সুযোগ করে দেয়। দীপু চলে যাচ্ছিল, সুদীপ্ত বলে তুমি থাকতে পার, যাওয়ার দরকার নেই। শিবু বরঞ্চ আমাদের চায়ের ব্যবস্থা দেখুক।

দিগেন শিবুর দিকে তাকিয়ে বলে, যা তুই স্কুলে যা। ওই হাফ সার্টটায় দেখতো কত আছে? দু পাকিট বিড়ি এনে দিয়ে যা।

সুদীপ্ত নিজের পকেট থেকে একটা আধুলী বার করে, আমার জন্যে দু প্যাকেট চারমিনার।

আশে পাশেই সব ছিল। বাকীদের ডাকতে হয়েছে ইউনিট অফিস থেকে।

ঘটনা বিস্তারিত বলার দরকার হয় না। সকলেই জানে। আলোচনা যা, এখন করার কি আছে তাই। সুদীপ্ত আঞ্চলিক সমিতির মত ব্যাখ্যা করে বলে, এখন আমাদেরই ভাবতে হবে, কি করা যায়।

বড়দা, প্রথমে মাথা তোলেন, এ ব্যাপারে আপনার নিজের কোন সাজেশন থাকে তো, রাখুন না তা হলে, আলোচনার সুবিধে হয়।

দিগেন কেড়ে নেয়, সুদীপ্ত শেষে তার সাজেশন রাখবে। তার আগে আপনাদের মতামতটা বলুন।

অমূল্য ভট্‌চাজ, পাকামাথা, বেশ ভেবে চিন্তে আস্তে আস্তে কথা বলেন। তার সেই নিজস্ব ভঙ্গিতেই সুরু করেন, কমরেডস, এ ব্যাপারে আমার যা মনে হয় খুব বেশী আলোচনার অবকাশ নেই। এখুনি পাড়ার সবাইকে দলবেঁধে থানায় যাওয়া দরকার। কারণ এটা হতে দেওয়া যায় না। আজ এভাবে কচু গাছ কাটতে দিলে কাল ওরা ডাকাতি করবে এবং দিন দুপুরেই করবে।

বড়দা, তোতন, উদ্দীপ্ত স্বরে প্রায় চীৎকার করে ওঠে আমরা একমত।

তারু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, শুধু একমত হলেই কি চলবে? তাকে কার্যকরী করতে হলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। সকলকে জমায়েত করতে হবে।

নেপাল ঠোঁট ভেঙচায়, একেবারে যে মিটিন-এর মতো বাত মারছিস, করতে হবে নাবলে, বেরিয়ে পড়োনা বাবা। আমি নয়া মহল্লার দিকে যাচ্ছি। তোতন, বড়দা নামোপাড়া, বোসপাড়া দেখুক, আর তোরা উপরপাড়া।

দিগেন প্রায় ধমকের সুরেই নেপালকে থামিয়ে দেয়, ওটা হচ্ছে কি কমরেড, এটা কি সিদ্ধান্ত হয়ে গ্যাছে ? আরও তো রয়েছেন, ওঁদের আলোচনা করতে দিন, সুদীপ্ত আছে, সুদীপ্ত বলবে।

নেপাল আগে থেকেই উত্তেজিত হয়েছিল, ও এরপর বলে ওঠে, দিগাদা আমরা তোমাদের অত মিটিং-টিটিং বুঝি না। বুঝি যেটা, মেসোমশাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষুণি হবে।

সুদীপ্ত সিগারেট ধরাচ্ছিল, দেশলাইর কাঠিটা নিভিয়ে কোথায় ফেলবে, চারধারে তাকাচ্ছিল, তারপর এক হাতে ধরে থেকেই বলে, নেপালের কথাই ঠিক। তবু সব বিষয়েই একটা শৃঙ্খলা আছে তো। সেটা মানতে হবে বই কি ! যদি ধরুন এক্ষুণি এমন একটা পর্যায়ে না গিয়ে, বলে কয়ে কাজ হাসিল হয়ে যায় সেটা কি খুব খারাপ হবে ? অহেতুক কিছু ছেলেকে বিপদে ফেলার মধ্যে কি সুচিন্তার লক্ষণ দেখা যায় ?

চুপ চাপ মাথা গুঁজে বসেছিল নন্তু। সুদীপ্তর উপর ওর বরাবরের রাগ। কোন দিনই ওর ভালো লাগেনা ওকে। কেমন যেন মেয়েছেলের মতো কথা। সুদীপ্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অধৈর্য হয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলে ওঠে, ওসব বিপদ টিপদ বুঝিনা। অমূল্য কাকু যা বলেছেন তাই ঠিক। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। ওদের ওই ভাবে সুযোগ করে দেওয়া যায় না। পরন্তু আমার সাজেশন হচ্ছে আর কোন কথাবার্তা না বাড়িয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে থানায় পৌঁছুতে হবে।

নন্তুর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এবং বলার ঢংএ সকলেই চুপ হয়ে যায়। কোন কথা কেউই বলে না। সুদীপ্তই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষ পর্যন্ত ইতি টানে, বেশ তাই হোক আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। আমরা জোড়তলে থাকছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সব উঠে দাঁড়ায়।

এই সেই জোড়তল। গাঁয়ের কোন পূর্ব পুরুষ কখন কি ভেবে লাগিয়েছিলেন কে জানে? হয়ত অহেতুক কৌতূহল, হয়তো কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, একদিনের এই বটবৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজ থেকে ডালপালা মেলে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে আজ। চারধার থেকে রাস্তা এসে মিশেছে। এর দুটো পৌর অঞ্চলের, আবার দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের দুটো ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের। পৌর অঞ্চলের রাস্তা পাকা, কালো পীচ ঢালা। জেলা বোর্ডের রাস্তা লাল কাঁকুড়ে মাটি আর নুড়ি বিছানো। পূব-উত্তরাংশে ছোট্ট এক ফালি পোড়ো জমি। বহু জমায়েত, বহু ঘটনার সাক্ষী। জাতীয়তা-বাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মাঠেই প্রথম বল্লভভাই প্যাটেল সভা করে গিয়েছিলেন ত্রিশের দশকে। আবার ছেষট্টির দশই মার্চ সাধারণ নাগরিকদের উপর স্বাধীন পুলিশ গুলি চালানোর বিরুদ্ধে এই ময়দানেই সভা করে গেছেন জ্যোতি বসু। সভা করেছেন, কবি সুধীন দত্ত। উপলক্ষ্য ছিল ইন্দো-চায়না সংস্কৃতি সংহতির প্রকাশ্য সম্মেলন। আবার সভা করেছেন অতুল্য ঘোষ, বিষয় ছিল চীন-ভারত সংঘর্ষ। প্রতি বছর গাজনের মেলার বিশেষ আকর্ষণ এই জোড়তল আবার এই জোড়তলেই প্রতি তিন বছর পরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্মেলনগুলির প্রকাশ্য অধিবেশন। এমনি লিখিত-অলিখিত, প্রচারিত-অপ্রচারিত হাজারো ঘটনা, হাজারো ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই জোড়তল। লাখো মানুষের পদচিহ্ন নিয়ে, গর্বিত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বুক চিতিয়ে বর্ষায় ভিজছে, রোদে পুড়ছে, শীতের হিমে লাঞ্ছিত, শরতের স্নিগ্ধ প্রলেপে আহ্লাদিত।

এই সেই জোড়তল, বহুদিন বাদ বুঝি আবার আঞ্চলিক মানুষ-গুলির পদভারে কেঁপে উঠলো। মাত্র আধ ঘণ্টার এত্তেলায় শ-দুই মানুষ জমায়েত হয়ে গেল। নানান বয়সের ছেলে-মেয়ে, যুবক-

যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এমন কি বাচ্চা কোলে দু-একজন মা'ও। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কিছুক্ষণ পর দল বেঁধে রওনা হয়ে গেল থানার দিকে সবাই, দর্পিত পদভারে আকাশ কাঁপাতে কাঁপাতে।

বিকেলের দিকে নিউ টাউন থেকে বাণী এসেছিল। সঙ্গে বিপিনদা। দিন ক' ধরে বিপিনদার পিঠের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। কোন সেই প্রথম দশ বছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়ে। দেশবন্ধু তখন দেশের প্রতিটি পরিবারের একজন করে মানুষকে ময়দানে নেমে আসতে ডাক দিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে।

বিপিনদা হাওড়া কোর্টের উপর থেকে ব্রিটিশদের পতাকা টেনে নামিয়ে তিনরঙের জাতীয় পতাকা তুলে দিলেন। দশ বছর বয়সেই কারাবরণ। সবাই অবাক হয়ে গেল, কে এই দামাল ছেলে? ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই বয়সেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে দেশ সেবায়।

বিপিনদা অনেকেরই প্রেরণা সেদিন।

আর সেই যে শুরু আজও একটানা চলছে সংগ্রাম। ব্রিটিশ গিয়েছে তার জায়গায় এসেছে তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয়তা-বাদী নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষ কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই।

তিনি প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন, আই উইল নট রেষ্ট। মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা চাই। যতদিন তা আদায় না হবে আমি বিশ্রাম নেব না। আমাকে এই ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীন সরকারও তাকে রেহাই দেয়নি। বহু সংগ্রামের বীর নায়ক মাসের পর মাস বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। জেলে তার স্বাস্থ্য ভেঙেছে, বাঁচার কোন লক্ষণ নেই। তিনি মুক্ত হয়েছেন।

বাইরের হাওয়া তাঁকে আবার নবজীবন দিয়েছে। তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই ভাবেই জীবনের প্রায় পঞ্চাশটা বছর একটা একটানা সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৩৫ সালে প্রথম এই এলাকায়। তারপর থেকে আজও নিরবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। রাণীগঞ্জ পেপার মিল দিয়ে যার শুরু, সেনর‍্যালে ইউনিয়নেই হয়তো তার জীবনের শেষ ইতিবৃত্ত রচনা হতো।

কিন্তু তাই কি? প্রায় পঙ্গু বিপিনদার চোখের ঘুম যেন কারা কেড়ে নিয়েছে। না আজও তার থামবার অবকাশ নেই।

বাণী সিংহ আঞ্চলিক অফিসে বিপিনদাকে জানালেন, আমি একটু দিগেনদাদের বাড়ী ঘুরে আসব। মেসোমশাইকে হঠাৎ ধরে নিয়ে গেছে।

অসুস্থ বিপিনদাও তৈরী হলেন, আমিও যাব।

আপনার এই শরীর নিয়ে! ঠিক হবে কি?

হেসে ওঠেন বিপিনদা, এক্ষুণিই আমাকে বাতিল করে দেওয়া। উঁহু, অত সহজে সেটা হচ্ছে না। আমার এখনও অনেক কাজ! তুমি না নিয়ে গেলে আমি একাই যাব।

বিপিনদার এই রকম দৃঢ় ঘোষণার পর বাণী সিংহ আর বাধা দেয় না। একটু ঝুঁকে বাঁ হাতটা কাঁধে তুলে, কোমরে ধরে বলে, উঠুন।

চারুবাবুরা এখানকার আদিবাসিন্দে নন। এখানে আসার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। এর আগে ছিলেন কাশীনাথ পুরে। আশেপাশে দু-দশটা কোলিয়ারীর পত্তন হয়েছিল পুরনো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। চাষের জমি ছিল মোটামুটি গাঁ-ঘরের দু-চারজনা ছাড়া প্রায় বাকী সকলেরই। চাষই ছিল রোজগারের একমাত্র সম্বল। কিন্তু কোলিয়ারীর জন্যে জায়গা দখলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লোক চাকরী পেয়ে গেল কোম্পানীর ঘরে। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে চাষের এতে কোন ক্ষয়ক্ষতি বুঝতে পারেনি সাধারণ মানুষ। জমি ওদের দিতে তাই তেমন আপত্তি করেনি। কিন্তু চূড়ান্ত বাধা

দিয়েছিল যখন সরকার থেকে এরোড্রামের জন্য জমি দখল শুরু হয়েছিল তখন। চারুবাবুদেরও জমিজমা ছিল ক'বিঘে। রিক্যুই-জিশনের চিঠি আসতেই বুঝতে পারলেন চারুবাবু সমস্ত জমি সহ বাড়ীটাই পড়েছে তার আওতায়। আরও অনেকগুলো পরিবার হল তাদের মতোই নিঃস্ব। মরবার আগে যেমনভাবে জীবনদীপ একবার দপ করে জ্বলে ওঠে সে ভাবেই পরিবারগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, না, জমি আমরা দেবনা, না, কিছুতেই বেচব না।

—জমি আমাদেরও চাই, যুদ্ধ তো হচ্ছে তোমাদেরই স্বার্থে।

—মিছে কথা। যে যুদ্ধে আমাদের ধনপ্রাণ, সহায়-সম্পদ সব খোয়াতে হবে সে যুদ্ধ আমাদের স্বার্থে হচ্ছে তা আমরা বিশ্বাস করিনা। না, কোন প্রয়োজন নেই এ যুদ্ধের। এ যুদ্ধ আমরা চাইনা। আমরা ক'ঘর শুধু বাঁচতে চাই, জমি নিয়ে সুখে দুঃখে।

—তোমরা ন্যায্য দাম পাবে, ক্ষতিপূরণ পাবে।

—জমির কি কোন দাম হয় বাবু মশায়রা? মাকে কি টাকা দিয়ে কিনতে পারেন? কাঁচা টাকা নিয়ে আমরা কি করব? রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ আর না খেয়ে মরব আমরা?

—চাকরী পাবে!

—না, চাইনা চাকরী!

—বেশ, তা হলে জোর করেই দখল করা হবে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই করগো সাবরা, বাবুরা। আমাদের মারো। ভেসে যাক আমাদের তাজা রক্তে জন্মভূমির সবুজ ক্ষেত। তোমরা গুলি চালাও যতো পারো!

সাময়িক পিছু হটতে হলো। কিন্তু থামলো না। জমি ওদের চাই-ই। এরপর দালাল লাগানো হল। দালালেরা কথার মার-প্যাঁচে, নানান কৌশলে দু-একজন করে বাগিয়ে নিয়ে এলো সরকারী দপ্তরে।

খাকী পোশাকী দিশি সাহেবের দল চিৎকার করে ওঠে, তোমার নাম রহিম। মিঞা?

—জি হ্যাঁ!

—আমিনা কোন্ আছে?

—আমার মেয়ে হুজুর। মা মরা একটি মাত্র ছাওয়াল আমার।

—সাদি উদি কুছু হোয় নাই?

—না হুজুর। দিতে নাই পেরেছি।

—হুম্। পারবে থাকতে? পাশেই থাকবে গোরা পল্টন? সোলেমান কোন আছে?

—ভাই!

—তারও একটা ভালো চাকরীর দরকার না? একশ, দেড়শ টাকার চাকরী। ভেবে দেখো যা ভাল হয়। নগদ বিঘে পিছু তের কুড়ি পনর টাকা। আচ্ছা আভি ভাগো। ভেবে এসে কাল বলে যাবে। নিজে নিজে ভাব, বুঝলে? বুদ্ধি ধার নিতে যেওনা বুঝলে বোক্‌চাঁদ।

তুমি সোনাতন মণ্ডল? দত্তদের সাথে তোমার মোকদ্দমা জমি নিয়ে? তুমি কি লড়তে পারবে? মিছাই লড়ছ, জমি দিয়ে দাও আমাদের। ঝগড়া আমরাই মিটিয়ে নেব। অবশ্য টাকাটা তুমিই পাবে। সঙ্গে ছেলেটার চাকরী।

এমনি সব প্রলোভন! এই ভাবেই হাতছানি, এই ভাবেই লাভের ইশারা। ধৈর্যের বাঁধ একদিন সত্যই ভেঙে পড়ল। কপালে জুটলো কাঁচা-পয়সা, মিলিটারী গোলামী। শান্তি প্রয়াসী, সুখী পাখীর নীড় গেল ভেঙে। বন্দী হলো সোনার খাঁচায়।

চারুবাবু তখন জোয়ান। জমি হারিয়ে, বাড়ীঘর হারিয়ে পেল মিলিটারী চাকরী, আর নগদ ভিক্টোরিয়া ছাপ মারা নোটের

বাণ্ডিল। গ্রুপ সি. সাতশ তেইশ নম্বর রেজিমেণ্টের ষ্টোর-কিপার। চারুবাবু তখন কিছুই আর ভাবতে পারেননি। কিন্তু-আজ বুঝতে পেরেছেন কি সর্বনাশ তাদের হয়েছে। যে চারুবাবু একদিন হাসতেন প্রাণখোলা হাসি, সুনন্দার চিবুক ধরে তাকে দিতেন সরমে মেরে। সেই চারুবাবু হাসতে গেলে এখন দেখতে পান ময়লাজমা ক'পাটি দাঁতই কেবল শুকনো চোয়াল ভেঙে দেখা দেয়। সুনন্দার চিবুকে হাত দিতে হাত বেশীদূর ওঠেনা। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ক্ষুদে বিজাণু যেমন করে ধীরে ধীরে দেহে প্রবেশ করে সারা দেহটাই একদিন ঝাঁজরা করে দেয়, তেমনি ভাবেই যুদ্ধের মারণ প্রতিক্রিয়া টুকরো টুকরো করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নকে। আজ যা চলছে, তার চেয়ে না চললেই বা কি এমন ক্ষতি? যুদ্ধ যেদিন শেষ হলো তার কিছুদিন পরে নেমে এলো ছাঁটাইয়ের খড়গ। তারপর অনেক ঘুরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এই ছোট মহকুমা শহরে এসে কোন রকমে মাথা গুজরান। লজেন্স কারখানার খাতা লেখা, হিসেব রাখা। কোন সেই তেত্রিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল। চলছে আজও।

থানা থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। প্রথমে তাহা অস্বীকার করে ফেললে থানা কর্তৃপক্ষ এমন কোন কেস তাদের কাছে আসেনি। অহেতুক চেল্লাচেল্লি করে কি হবে। কিন্তু যা অতি বাস্তব তাকে অস্বীকার করলেও মন মানবে কেন? মানুষ শুনবে কেন? সকাল বেলা পাড়াপড়শী সকলে মিলে যা প্রত্যক্ষ করল, তুড়ি দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেই কি চালান সম্ভব? এরা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলে চারুবাবুকে না নিয়ে কিছুতেই ফিরছিনা। দরকার হয় মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।

অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। সুদীপ্ত এবং দিগেন এস. ডি., ও. এস-পি এমন কি জেলা শাসককে পর্যন্ত ফোন করেছে।

সকলেরই এক কথা এক্ষুণি কিছু বলতে পারছিনা, তবে দেখছি কি করা যায়।

বেশ তাই দেখ। আমরাও আপাতত উঠছিনা। বেলা যত বাড়ছে ভীড়ও তত বাড়ছে। খবর গেছে অন্যান্য ইউনিটে। সকলেই কিছু কিছু করে লোক পাঠাচ্ছে। ছাত্ররা যুবকরাও এসে পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে মিস্তির দারোগা বার কয়েক বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। এই ভাবে শান্তি নষ্ট করা মেনে নেওয়া হবেনা বলে হুমকি দিয়ে গিয়েছেন। তাতে কোন ফল হয়নি। উপরন্তু বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেছে। মানুষ আরও বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

ও. সি-র ও ধারণা ছিল খানিকক্ষণ চেল্লাচ্ছে চেল্লাক, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ফিরে যাবে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই একই অবস্থা। কেউ, একজনও নড়ছেনা। হল্লা, চিৎকার ক্রমশই বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ধ্যার আগে ঘোষণা করলেন, চারুবাবু আছেন, তবে মুক্তি দেওয়া যাবেনা। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ আছে। কাল কোর্টে প্রডিউস করব।

তোতন চিৎকার করে ওঠে, এতক্ষণ কি তা হলে আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলেন।

অন্য সময় হলে কি হতো বলা যায়না। কিন্তু উত্তেজনা এখন তুঙ্গে, স্বভাবত তাকে প্রশমিত করতে হলে বাবা বাছা একটু করতে হবে। তা ছাড়া হাতেও কোন বেশী লোক নেই। ও.সি. বারান্দার উপর থেকেই জবাব দিলেন, ইয়ার্কি নয় ভাই! স্পেশাল পুলিশের কাজ এটা। আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। যাক, এবার আপনারা ফিরে যান। আমি কথা দিচ্ছি কাল কোর্টে প্রডিউস করা হবে। যাতে বেল হয়ে যায় আমি চেষ্টা করব।

ছোটখাটো চেহারা নিয়ে বড়দা চিৎকার করেন, লিখে দিন। আপনাদের বিশ্বাস নেই মশাই। পুলিশ কারো বাপের নয়।

শতকণ্ঠে সবাই সায় দেয়, হ্যাঁ লিখে দিতে হবে, লিখে দিতে হবে।

সুদীপ্ত এবং দিগেন বোঝাবার চেষ্টা করে লিখে ওরা দেবেনা। তবে এতগুলি মানুষের সামনে প্রকাশ্যে যখন ঘোষণা করেছেন তখন অযথা কিছু করার বিপদ আছে।

প্রথমে এতে সন্তুষ্ট না হলেও আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো এবং সন্ধ্যার অল্প আগে অনেকটা উদ্দীপনা নিয়েই ফিরে এলো সব।

ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন টিপ্পনী কাটলো, কাল যদি জামিন না হয় বেটা তবে তোদের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ব।

যাই হোক শ্রাদ্ধ অবশ্য করতে হয়নি কাউকে, জামিনে ছাড়া পেয়েছেন চারুবাবু পরদিনই। কিন্তু চারুবাবুর বিপক্ষে চার্জ অনেক, চারুবাবুর ঘরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা পাওয়া গেছে, টেলিফোন ভবনের সামনে পুলিশের উপর বোমা ছুঁড়েছেন এবং উসকানি দিয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেছেন।

চারুবাবু ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি! যেমন বোবার মতো চুপচাপ ছিলেন, তেমনি চুপচাপ হয়েই রইলেন এবং ছাড়া পাওয়ার পর কাউকেই কোন কথা বললেন না। আসলে তিনি বুঝতেই পারলেন না ব্যাপারটা কি ঘটে গেল। কোত্থেকে কি হলো, শুধু বুঝতে পারলেন সম্ভবত তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা-চালাবার একটি গিনিপিগ ছাড়া আর কিছুই নন।

থানা হাজতে একবার শুধু শুনতে পেয়েছেন নান্নু দারোগা বড়বাবুকে বলছেন, রঙ ইনফরমেশন, সবটাই ভুল হয়ে গেছে। যাই হোক সামলে নিতে হবে! ইটস পিওরলি এ রঙ ইনফরমেশন।

ঘরে ফিরতে দিগেনের অন্যদিনের চেয়ে বেশী রাত হয়েছিল। সে দিবস উপলক্ষ্যে ছিল পার্কে জনসভা। বাইরে থেকে দু'জন

এম. পি. এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন তাঁরা। তারই আলোকে বর্তমান দেশের পরিস্থিতি ও বিশ্লেষণ করলেন। স্বভাবতই সভা যখন ভাঙবার কথা তার চেয়ে ঘণ্টাখানেক বেশী সময় লেগে গেল। মিছিল করে পাড়া থেকে সবাই এক সঙ্গেই গিয়েছিল, মিছিল করেই ফিরে এসেছে। খেয়ে দেয়ে বিছানায় গা এলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দিগেন। ঠিক কতক্ষণ এ ভাবে ঘুমিয়েছিল বলতে পারবেনা। হটাৎ জানলার কাছে খসখস একটা শব্দ। জাফরি কাটা জানালার ভেতর হাত দিয়ে তোতন ওকে ফিস ফিস করে ডাকছে, দিগাদা, এই দিগাদা।

হকচকিয়ে উঠে বসে দিগেন, কি হলো, দিলি তো' কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে।

—ঘুম ছাড়ো এখন। তোতন রিতীমত হাঁফাচ্ছে।

—কি ব্যাপার ? চোখ বিসফারিত করে দিগেন জিজ্ঞেস করে।

—শালারা পাড়া ঘিরে ফেলেছে। চটপট কর। কোম্বিং অপারেশন আরম্ভ হয়ে গেছে। বড়মা পাঠিয়ে দিল আমাকে !

—তুই কোথায় ছিলি ?

—ইউনিট অফিসেই ছিলাম। গরমে আর ঘর যাইনি। অফিস অবশ্য ফাঁকা, কিছুই পাবেনা সেখানে। নেপাল, নন্তুও ছিল। ওরা সরে গেছে। এখন একমাত্র তুমি একটু সরে থাক। বাকীটা আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

দিগেন তাড়াতাড়ি প্যান্টের ওপর জামাটা চাপাতে যায়। তোতন বিস্ময়ে চোখ তোলে, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ? লুঙি পর, লুঙি।

দিগেন সম্বিত ফিরে পায়। সত্যই তো এ ওকি করতে যাচ্ছে। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখাই হলো গিয়ে আসল। আর দিগেন ঠিক এই সময়েই কিনা ঘাবড়ে যাচ্ছে।

পাশের ঘরে দীপু, শিবু এবং মা ঘুমুচ্ছে। বেশী হৈ চৈ করা যাবে না। তাহলে দাদু আবার উঠে যাবেন। দাদুর ঘুম এমনিতেই পাতলা। অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিতেই দীপুর ঘুম ভেঙে যায়, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দিগেন বলে, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তোরা সাবধানে থাকবি।

—বাইরে, কোথায় ?

—জানিনে। মাকে তোলার দরকার নেই। পাড়ায় কোম্বিং হচ্ছে। শোন, আমার আর একদম দেরি করা চলবেনা। তুই ঘর সামলাবি ! আমি চল্লুম।

দীপু কোন কথা না বলে শুধু নীরবে ঘাড় নাড়ে। দিগেন এবং তোতন দেওয়াল টপকে পিছনের দিকে এগোয়। কোন রকমে উকিলের বাড়ীর পেছনে পড়তে পারলেই ফাঁকা মাঠ, বাঁ পাশে বাগেদের জোড়া ডোবা। যে কোন দিক দিয়েই নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যেতে পারবে। রাস্তার ও পাশেই শহর নিকাশের বড় নালাটা।

তোতন আগে আগে এগোয়। খানিক দূর গিয়ে শিষ দিয়ে সংকেত জানায়, চাপা গলায় বলে, এগুও দিগাদা সব ঠিক আছে। বাঁ ধার ধরে এগুবে। ডান ধারে গেলেই ডোবা।

দিগেন জানে সেটা। দ্রুত পা চালিয়ে তোতনের কাছে পৌঁছে যায়।

বাউড়ী পাড়ায় চিৎকার এবং কান্না শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রাণপণ চিৎকার।

দিগেন দাঁত কিড়মিড় করে, ওদিক থেকেই আরম্ভ করেছে। কত তুলবে কে জানে। বাইরে থেকে এসে হারামির বাচ্চারা একদম জ্বালিয়ে মারলে।

তোতন চাপা বিক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠে, ওরাতো জ্বালাবার

জন্যেই এসেছে দিগাদা। কিন্তু আমাদের দাদাদের কি ঘুম ভাঙবে না। আর কত সওয়া যায় তুমি বল'দিকিনি ?

দিগেন তোতনের বিক্ষোভ বুঝতে পারে। কিন্তু হুট করে একটা কিছু করে বসলেই তো আর হবে না। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। দিগেন তোতনের একদম সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ায়। ডান হাতটা আলতো ভাবে তোতনের কাঁধে রেখে বলে, ভাই সবই তো বুঝছিস। কিন্তু আমরা কি বিশু-মণ্টুদের মতো যা একটা হোক করে বসতে পারি ? আমাদের দায়িত্ব কত বেশী বলতো ? কত মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সামান্য একটু ভুলের জন্যে কি বিরাট খেসারতই না দিতে হতে পারে। মনে রাখিস ভাই বিপিনদার কথা, সামান্য একটা ভুল বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে।

তোতন চুপ করে পথ চলতে থাকে। তার সতর্ক নজর কোন দিকই এড়ায় না। বড়দার কাছে ভার নিয়ে এসেছে দিগেনকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবেই। কোন ঝুঁকিই নেওয়া চলবেনা। কারণ এই সময় দিগেনকে হারান চলবেনা। তা হলে এলাকার সংগঠনের পক্ষে খুবই ক্ষতি। তোতন বড়দাকে কথা দিয়ে এসেছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কমরেড। তোতন যে ভার নেয়, জীবন দিয়ে তা পালন করে।

বড়দা গম্ভীর ভাবে সায় দিয়েছিলেন, সে বিশ্বাস আমার আছে কমরেড। তবু সাবধানের মার নেই। সতর্ক তোমাকে হতেই হবে !

সে তো হাজার বার।

সুতরাং তোতনকে অসতর্ক হলে চলবে না। গত শনিবার কসাই মহল্লায় কোম্বিং হয়েছিল। শহরের যে কোন অঞ্চলেই ঘেরাও হতে পারে যে কোন দিন। সকলেই কেমন যেন সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে চলাফেরা করে। কেমন যেন অঘোষিত সতর্কতা।

আজই যে নামোপাড়া ঘেরাও হবে তা এরা কেউ ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারলে আরও একটু বেশী সতর্ক হতে পারতো !

কোম্বিং-এর অভিজ্ঞতা এদের আছে। শনিবারের কসাই মহল্লায় প্রথম দিনের শিকার তিনজন। সোলেমানের বাবা, গন্নুর বাইশ বছরের তাজা বৌ আর নান্দু মালীর কচি ছেলেটা !

সেদিন কী এক আদিম গুহার যুগ নেমে এসেছিল সারা মহল্লা ঘিরে। ঘন রাতের অন্ধকারে কয়েক ভ্যান সি. আর. পি. সমস্ত এলাকাটাই ঘিরে ফেলেছিল সেকেণ্ড অফিসারের নেতৃত্বে। অন্য দিনের মতোই নির্ভাবনায় সারা রাতের মতো নিজেদেরকে যারা নিদ্রাদেবীর কোলে সমর্পণ করে দিয়েছিল তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি কি নিদারুণ দুর্যোগ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বিশ্বাস করতে পারেনি তারা সত্যিই সভ্য যুগে বাস করছে বলে।

গন্নু রাতের শিপ্টে কাজে গেলে সোলেমান দাওয়ায় শুয়ে বাড়ী পাহারা দেয়। পাশাপাশি বাসিন্দে। এদের জীবনে ধর্ম এমন কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি !

আঁটসাট আটপৌরে একটা কাপড়ে কোন রকমে বাধা না মানা দেহটা জড়িয়ে শুয়েছিল গন্নু বৌ।

ইয়া গোঁফওয়ালা সবুট দেহটা যখন তার চৌকাঠে এসে পড়ল তখনও গন্নু বৌ বুঝে উঠতে পারেনি কি ঘটতে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হারিকেনের আলোয় দেখতে পেলো লোকটা চারধারে টর্চের আলো ফেলে কি যেন খুঁজছে। তারপর গন্নু বৌর বুকের উপর আলো পড়তেই বাজখাই কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, খবরদার, চিৎকার করবি না। পরক্ষণেই ঘরটার চারধারে চোখ বুলিয়ে পুনরায় বাজখাই আওয়াজ তুলে জিজ্ঞেস করে, উ শালা কাঁহা হ্যায় ? বোম ছোড়নেওয়ালা গনা ?

ততক্ষণে গন্নু বৌ থতমত খেয়ে উঠে বসেছে। কোন রকমে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে বলে, উ তো

—ডিউটি! চোপ শালী! কাঁহা ছিপাকে রাখা হায় বোল। এইও তুম লোক বাহারমে ঠারো। হাম ইধার দেখতা হায়। বাইরে অপেক্ষা রত সিপাইগুলিকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয়।

আসলে গনু বৌকে ওরকম অবিন্যস্ত অবস্থায় দেখে হাবিলদারটার সব কিছুই কেমন গুলিয়ে যায়। এদিকের পাড়াটা ওর ভার পড়েছে। কারো কিছু করবার নেই। আসামী পাকড়াবার জন্যে ওদের যে কোন ব্যবস্থার জন্যে খুল্যেখুলাম নির্দেশ আছে। সুতরাং ওদের আর পায়কে। এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে টক্করের সময় গুলিতে মারা গেলে সে মৃত্যুর জন্য কোন রকম তদন্ত হবে না।

গোঁফের ফাঁকে জিভ দিয়ে দুবার ঠোঁট ভিজিয়ে নেয় হাবিলদারটা। জ্বলন্ত চোখে গনু বৌকে লেহন করছে। এ নজর গনু বৌর চেনা। ভয় পেয়ে যায় গনু বৌ। ক্রমশঃ দেওয়ালের দিকে সিঁটিয়ে যেতে থাকে ও! হাবিলদারটা সতর্কভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার পা বাড়ায়।

গনু বৌ আতঙ্কে চিৎকার করতে যাবে। হাবিলদারটা মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ চেপে ধরে কর্কশ হাতে। এক টানে আটপৌরে কাপড়টা চড়চড় করে খুলে ফেলে। বৃথাই বাঁচবার চেষ্টা করে গনু বৌ। প্রাণপণে গায়ের যত জোর আছে তা দিয়ে শূয়ারটাকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করল একবার।

ক্ষেপে গেল হাবিলদারটা। এক হাতে কাপড়টা টেনে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কষে মুখটা বেঁধে দিল। সবুট দুপায়ে চেপে ধরতে অসহ্য বেদনায় ককিয়ে উঠল গনুবৌ। ক্রমশ পেছনের দিকে বেঁকে যেতে লাগল। আর বন্য হাবিলদারটা বলাৎকার করার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল। ইচ্ছে মতো সে তার আদিম লালসা চরিতার্থ করল। অস্পষ্ট গোঙানী শুনে হঠাৎ সোলেমানের ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের দিকে লক্ষ্য করে ডাকে, এই বৌ, বৌ!

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

উঠে আসে সোলেমান। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পায় কে যেন চেপে ধরে আছে। গনু বৌ অসহ্য দহনে গোঙাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে মাথায় রক্ত চেপে যায়। চকিতে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে আসে বুড়ো সুলেমান। দরজার পাশ থেকে ঠেকনোটা তুলে নেয়, খবরদার বলছি।

কিন্তু আর' কিছুই বলতে পারলোনা সুলেমান। ঠেকনোটা উপরে তোলার আগেই হাবিলদারটা কোমরের বেল্ট থেকে ইস্পাতের যন্ত্রটা খুলে নিয়ে সঠিক তাকে ট্রিগার টিপল। মাত্র একটিই গুলি। ফুসফুসটা ফাটিয়ে দিল বৃদ্ধের।

হায় আল্লা, বলে লুটিয়ে পড়ল সোলেমান। হাবিলদার আরও উন্মত্ত হয়ে উঠলো। গনুবৌর উপর চূড়ান্ত অত্যাচার চালিয়ে উঠে আসবার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে ও একটিই বার আবার ট্রিগার টিপল। তৃতীয় মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিল কসাই মহল্লায় নান্দু মালীর ছোট্ট ছেলেটার। মাঠের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। এক ঝাঁক গুলি এসে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তার দেহটা।

না আর চিন্তা করতে পারেনা দিগেন। কি একটা অসহনীয় উদ্বেগ ক্রমশ তাকে চঞ্চল করে তোলে। আজ তাদের নামো পাড়ায় কি হচ্ছে এতক্ষণে কে জানে। আর দিগেন কিনা নিজেকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

না, পালাবেনা সকলকে ছেড়ে। চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ায়, তোতনকে লক্ষ্য করে বলে, তুই এগো তোতন আমি ফিরে যাব।

—ফিরে যাবে? কোথায়? মহল্লায়? তুমি কি পাগল হলে দিগাদা? তোমাকে পেলে ভুলবেই। কিন্তু এখন তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

—তাই বলে কি কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাব?

—হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। দৃঢ় স্বরে জবাব দেয় তোতন। তার কণ্ঠস্বরের এই দৃঢ়তায় দিগেন কেমন যেন মুষড়ে পড়ে। তোতন আবার মনে করিয়ে দেয়, মনে রেখো এটা বড়দার নির্দেশ। বিপিনদার নির্দেশ।

পরক্ষণেই দিগেন্ আবার পা বাড়ায়, না আরেকটা গন্নুবৌ এপাড়ায় করতে দেবনা।

দুহাতে বুক আগলে দাঁড়ায় তোতন, কিন্তু কি করবে তুমি দিগাদা? কি আমাদের প্রস্তুতি আছে? এখুনি তুমি আমাকে বুদ্ধি দিলে, জ্ঞান দিলে। আবার নিজেই গোঁ করছ?

সত্যিই এবার হতাশ হয়ে পড়ে দিগেন। হয়তো এই সত্যি। এক একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলে এমনি ভাবেই পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়। তখন যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব সব মিছে মনে হয়। মনে হয় এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বুঝি আর কোন উপায়ই নেই। কিন্তু আসলে এটাই ফাঁদ। তোমার এইক্ষণে প্রস্তুতি নেই, উসকে যদি বিপথে জড়িয়ে ফেলতে পারা যায় তো, এক প্যাঁচেই কুপোকাত! ভবিষ্যৎ তখন অতল গর্ভে। অথচ তোমার চাই অশেষ ধৈর্য, অবিরাম পরিশ্রম। ধাপে ধাপে এগুতে হবে তোমাকে। এখানে ভুল করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। এতটুকু ফাঁক রেখেছ কি তাই দিয়েই সর্বনাশের পথ তৈরী হয়ে যাবে। সুতরাং, সাধু সাবধান।

এইসব ভাবনা দিগেনের মনে এলেও সবই কিন্তু বিপিনদার সতর্কবাণী। বিপিনদা সঠিক সময়ে সঠিক কথাটিই বলে দেন। আর তাকে রূপ দেন শঙ্করদা, সুদীপ্ত, দিগেন ও বড়দা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। বিপিনদা আর বড়'দার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট মিল আছে। আবার পার্থক্যও তেমনি।

দুজনেই এগুবে কি পিছুবে ঠিক করতে না পেরে থেমো জমির আলের মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরের জমাট-বাঁধা ঘুটঘুটে অন্ধকার যেন এখন আতলান্তিক মহাসাগর মুহূর্ত পরে।

তোতনই শুরু করে—তোমার পাগলামিটা এবার ছাড় দিগাদা। চলো যেখানে যেতে হবে নিয়ে যাচ্ছি। অযথা সময় নষ্ট করার সময় নেই।

দিগেন আর কোন কথা না বলে তোতনের সঙ্গে চলতে থাকে। কিন্তু মাথায় তখনও তার খচখচ করছে নামোপাড়ার হাজারো বাসিন্দে। আর গনুবৌর স্মৃতি! নিজের অলক্ষ্যে বুক চিরে নেমে আসে দীর্ঘ নিশ্বাস।

মোটামুটি এই এলাকাটা এখন এদের দখলে। এককালে প্রায় সকলেরই চাপ দাড়ি আর হিপিদের মতো রাশ রাশ চুল ছিল। চোঙা প্যাণ্ট তার উপর কোমরে ইয়া চওড়া বেল্ট। বেল্টের মাঝখানে প্রত্যেকেরই কালো চশমা ঝোলান।

এখন বাকী সব কিছুই আছে। শুধু চাপ দাড়ি চেঁচে ফেলা হয়েছে। তার পরিবর্তে গালের শেষাংশ তক নেমে এসেছে অগোছাল জুলফি।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দেবদার আর আমে ঘেরা রেলওয়ে বাংলোর চাতালটায় আড্ডা। এদের চোখ এড়িয়ে কারোই পালাবার জো নেই। বাবু, রেলের বড় অফিসারের ছেলেটার উপর ভার কে যায়, কে আসে লক্ষ্য রাখা। মাঝে মধ্যে মুখের মধ্যে দু-আঙুলে শিষ মেরে সংকেত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াই বাবুর কাজ কে যাচ্ছে না যাচ্ছে। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই দু দিক থেকে জড়ো হয়ে যায় দলের পাণ্ডারা। টুনু ঘোষের দল। নরেশ উকিলের বেটার দল। প্রথমে সবাই জানতো টুনু ঘোষ উগ্রপন্থী। দেশটাকে দিনা-দিনি ওরা বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে চায়। খতম আন্দোলনের অন্যতম পাণ্ডা।

ইদানিং টুনু ঘোষের সঙ্গে দেখা যায় সারাক্ষণ, ট্যারা কেষ্ট আর দীনু সিংকে। দয়াল শা মাঝে মধ্যে বাড়ীতে ডেকে ভোজের আপ্যায়ন করেন।

মোটকা মুদি থেকে ধীরেন কেরানি পর্যন্ত সকলেরই বাঁধা মাসোহারা আছে। মাঝে মধ্যে ওদের লোকজনদের পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়। কেউ অন্যথা করলে টুনু ঘোষ হুকুম করে, ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়।

হাতকাটা হারু বুঝি তৈরি হয়েই থাকে। এত্তেলা নিয়ে হাজির হয়ে যায়। শেডটার মধ্যে বসিয়ে বিচার আরম্ভ হয়।

হারু নয়তো গজু পিস্তলটা মেঝের উপর নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করে, কি ফয়সল্লা গুরু ?

টুনু গম্ভীর হয়ে হাতের ছোরাটা দিয়ে বার দুই কপাল আর নাকের ডগ থেকে ঘাম মুছে ফেলে, তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলে ব'কলমে প্রশ্ন করে, কি হলো, টাকাটা দেওয়া হয়নি কেন ?

আসামীর তখন তিন অবস্থা। বুক দুরুদুরু কাঁপা গলায় উত্তর করে, ভুল হয়ে গ্যাছে স্যার। অন্যায় হয়ে গেছে। এই যে সঙ্গেই আমি নিয়ে এসেছি।

কোন রকমে পালাতে পারলে বুঝি বাঁচে।

টুনু ঘোষ ক্ষমা করে দেয়, আর যেন কোনদিন এরকম শুনতে না হয়। তারপর বাবুর উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয়, শালা বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে আয়। আর বলে দে ভবিষ্যতে কিছু ব্যাগড়া দিলে দোকান উড়ে যাবে। তোর পেটোগুলো শালাকে দেখিয়ে দিস !

মুক্তি পেয়ে আসামী তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট।

অন্য দিনের মতো টুনু ঘোষ আজও এই নিয়ে তিন-চারবার চক্কর কাটলো। দীপু কি করবে ভেবে উঠতে পারলো না। দিন কয়েক ধরে কলেজে যাবার পথে, ডি. এম. ও. হাসপাতাল পেরিয়ে জি. টি. রোডে পড়বার আগে অনেকটা পথ বেশ নিরালা। পিচ ঢালা পাকা রাস্তার দুধারে দেবদারের সার। খানিক দূরে দূরে টাইল দিয়ে ছাওয়া পেল্লাই পেল্লাই সব বাংলো। রেলওয়ে অফিসারদের। বাইরে

থেকে যেকেউ ভাববে প্রত্যেকটা বাংলোই এক একটা কয়েদখানা। প্রথমে দেওয়াল, তারপর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

আগে এত ঘেরা-ঘোরা ছিল না। কিন্তু প্রায়ই রেলের লোকেরা বড় বড় মিছিল করে বাংলোয় চলে আসছে প্রতিবাদ জানাতে। প্রয়োজনে ঘেরাও চালাচ্ছে দিনের পর দিন। শ্রমিক অসন্তোষের হাত থেকে এভাবে তাদের সাময়িক নিরাপত্তা হিসেবে এই ব্যবস্থা।

এই নিরালা রাস্তাটা পেরুতে পারে না দীপু। টুনু ঘোষ সাইকেল করে কেবল চক্কর দিয়ে বেড়ায়। এঁকে-বেঁকে দীপুকে ঘুরে ঘুরে সাইকেল দিয়ে প্রায় ঘিরে রাখে। দীপু কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। টুনু ছাড়াও আশে পাশে সঙ্গোপাঙ্গগুলি ওত পেতে আছে। কেউ দেবদারের ছায়ায় কেউ প্রকাশ্যে রাজপথে। এদের মধ্যে বাবু কালভার্টে বসে উৎসাহিত করে টুনুকে, চালাও গুরু! আরেক চক্কর, তারপরেই ফয়সল্লা! বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের আঙুল দুটো জিভের ভেতরে পুরে কষে শিষ দিয়ে ওঠে।

অপমানে লজ্জায় দীপুর সারা মুখ লাল হয়ে যায়। কানের ভেতর দিয়ে যেন একশ ছয় ডিগ্রির আগুন ঝরছে। কপালের শিরা দপদপ করছে। কিন্তু নিরুপায় ও। হঠাৎ দীপু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুক টান করে গায়ে যত জোর আছে সমস্ত একসঙ্গে জড়ো করে প্রায় ধমকে ওঠে, এটা হচ্ছে কি ? পথ ছাড়ুন। নয়তো আপনার বাবার কাছে সব বলে দেব।

আচমকা টুনু ব্র্যাক কষে। বাঁ পায়ের ডগের উপর ভর করে দীপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠোঁট দুটো দিয়ে বজ্জাতি ভঙ্গি করে কপাল কুঁচকে বলে, আচ্ছা! এতক্ষণে তা হলে গলার স্বর বেরুল ? এটাই তো বাওয়া চেয়েছিলাম। তা কি যেন বল্লে, বাবাকে বলে দেবে! বেশ তাই বলো। তবু থেমে একটি কথা বলে যাও আজ।

দীপুর রাগ এবার ঘেন্নায় পরিণত হয়! টুনুকে পা থেকে মাথা

পর্যন্ত লক্ষ্য করে বলে, দেখুন এরপর কিন্তু আমি চিৎকার করে পুলিশ ডাকব।

টুনু আকাশ ফাটিয়ে অট্টহাসি হেসে ওঠে, কি করবে, পুলিশ ডাকবে? ডাকো, চিৎকার করে ডাকো। যদি কোন শালা আসে তো আমার টিপটা একবার পরীক্ষা হয়েই যাবে—বলেই কোমরে গোঁজা ছোট্ট একটা পিস্তল টেনে বার করে। আলতোভাবে নলটার উপর চুমু খেয়ে বলে, এটা দেখেছ, এটা কি বল দিকি? বলতে পারবে না। খাঁটি আমরেকী মাল। দয়াল শা'র কাছ থেকে কিনে দিয়েছে বাবা। বাবাটার চয়ছ আছে মাইরি! পরক্ষণেই পুনরায় দীপুর চোখে চোখ রেখে বলে, কি হলো ডাকবে না পুলিশকে?

দীপু থ' হয়ে যায়। টুনু ঘোষের কথা ও শুনেছে। কিন্তু এতদূর নেমে গেছে তা ভাবতে পারেনি। টুনু ঘোষ বিশুদের সঙ্গে নকশালী করতো। বহুদিন দেওয়ালে মাও-সে-তুং যুগ যুগ জিও লিখে এসেছে। এখন নাকি নেতা পালটেছে। অবশ্য যুগ যুগ জিও শ্লোগানটা ঠিকই আছে। দিন ক' থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু পেটাই হয়েছে। তারপর দয়াল শা'ই ছাড়িয়ে এনেছে। বাইরে এসেই নতুন দল বানিয়েছে। এখন টুনুর দল পাড়া কাঁপিয়ে রাখে। বিশেষ করে ওদের এই দখল করে রাখা এলাকাটা।

দীপু এবার ভয় পেয়ে যায়, খানিকটে মিনতির ভঙ্গি করে বলে, আমি আপনাদের কি ক্ষতি করেছি? আমাকে যেতে দিন।

ততক্ষণে সাথীরা এগিয়ে এসেছে, বাবু আবার চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, কি গুরু, ছুড়িটা কি বলছে, দেব নাকি এক ঝাড়।

বাবু! চিৎকার করে ওঠে টুনু,—শালা যেমনি গাড়ল, তেমনি গাড়লই রইল। কোথায় কি বলতে হয়, আজও শিখলে না। শালার বচনতো নয়, খাঁটা পায়খানা। চল যেখানে ছিলি গিয়ে বসগে যা। তারপর আবার দীপুর দিকে তাকিয়ে বলে, কিছু মনে করোনা মাইরি, ও শালা অমনিই! মুখের সব কটা স্ক্রুপ একদম

টিপ্পা। একদিন আমার হাতে এইসা ঝাড় খাবে না, কোনদিন ভুলতে পারবে না। বলতে বলতে তীব্র দৃষ্টিতে চলতে থাকা বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

দীপু কিছুই বুঝতে পারছে না, কি করবে এখন। কি উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিদিন টুনু ঘোষ তার পিছনে লেগেছে। বিশেষ করে দাদা বাড়ীতে না থাকার দরুনই যেন ওর এই বেয়াদপী আরও বেড়ে গেছে। আগেও মাঝে মধ্যে ওকে দেখলে শিষ দেওয়া কিংবা টিটকারি মারা চলতো। কিন্তু তেমন তোয়াক্কা করেনি তখন। দাদাকেও এ নিয়ে বলেনি।

টুনু এবার সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। হ্যাণ্ডেলটা একদিকে সরিয়ে দীপুকে যাবার রাস্তা করে দেয়, বলে ঠিক আছে, আজ ছেড়ে দিলাম নেহাত পাড়ার মেয়ে। নইলে আমাকে পুলিশ দেখিয়ে কোন মামদই রেহাই পায়নি বুঝেছো? আর শোন, কলেজে নাকি খুব পার্ট্টি-টার্ট্টি চালাচ্ছ? ওসব ছেড়ে ছুড়ে সিনেমায় নেমে পড়ো বাবা! চেহারাটা তো দিব্বি। মানাবেও ভালো। বলতো দয়াল শাকে বলে দিতে পারি। মালিক যদি রাজী হয়ে যায় তো বরাত শালা, তোমার খুলে যাবে। তখন দু হাতে পয়সা। বলবো নাকি?

দীপুর কান তখন ভোঁ ভোঁ করছে। পা দুটোই এত কাঁপছে যে কোন সময়ে পড়ে যেতে পারে। এখন দীপু কিছু বুঝতে পারুক আর না পারুক পথ পেয়েই দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করে দেয়, আরেকটু হলেই ভেঙে পড়তো ও।

চলার গতি দেখে হাসি পেয়ে যায় টুনুর। আকাশ ফাটিয়ে জোরে হেসে ওঠে। ততক্ষণে অন্যান্য বন্ধুরা সবে একে একে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। বাবু বলে, কি হলো, গুরু ছেড়ে দিলে যে? এই যে বললে আজ একটা হেস্ত-নেস্ত যা হোক ফয়সাল্লা করে ফেলবেই।

টুনু বিরক্ত প্রকাশ করে,—নে, নে চুপ কর। হবেক্ষণ। দেখিনা কতদূর খেলতে পারে? হীপপকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা

বার করে দু আঙুল দিয়ে টেনে নিজে একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা ছুড়ে দেয় দোস্তদের দিকে। ভাবটা ওটা আর ফিরিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

হাত কাটা কাল্লু টুনুর দিকে গদগদভাবে তাকিয়ে বলে, গুরুর নজর আছে মাইরি! রেগে রেগে যখন তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ভেতর তক্ পুড়ে যাবে! ওয়াদিয়া রেহমানের মতো। আরেকটু হলেই কেঁদে দিয়েছিল আর কি! ঠোঁটটা কেমন নড়ছিল দেখেছিস?

বাবু সায় দেয়, তা যা বলেছিস! কিন্তু গুরুকে বোঝাই দায়। কখন যে কোন মুডে থাকে বুঝে উঠতেই পারি না! তখন আমাকে তো প্রায় ঝেড়েই দিয়েছিল আর কি।

টুনু কোন কথা না বলে চলতে থাকে। পেছনে দলের পাণ্ডারা। কয়েক পা এগুলেই রেল বাংলোর মাঝামাঝি দু-তিনটে আম গাছের মাঝখানে বাতিল গ্যারেজটায় এসে হাজির হয়। এটা হলো ওদের গোপন আড্ডা। প্রকাশ্যে বসে রেল চাতালটায়। নরেশ উকিলের বিশেষ বন্ধু দয়াল শা এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক! দয়াল শার নানারকম ব্যবসা-পত্তর আছে শহরে, শহরের বাইরে। চালানী কারবারও আছে। হলোই বা হেরো এম. এল. এ.। আর আছে বে-আইনী চোলাইর ভাটিখানা। বাবু, হাত কাটা কাল্লু এরা হলো গিয়ে আবার সারাফত আর টুনুর মধ্যে যোগাযোগকারী। বাবুরা সরাসরি ওয়াগান ভাঙায় নেই। তবে মাল পাচার হয় এদের মাধ্যমেই!

টুনুর রাগটা অবশ্য অন্যত্র। টুনু তখনও এতবড় ওস্তাদ হয়নি। পাড়ার রকে বসে আড্ডা মারতো। কখনো কখনো এখানে ওখানে ছোটখাট মারামারিতে ভাড়া খাটতো। ব্যস ঐ পর্যন্তই। দিগেনের সঙ্গে একেবারে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। পাড়ায় ক্লাব করা নিয়ে প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ওর বেলেল্লাপানায় অতিষ্ঠ হয়ে সবাই মিলেই ওকে বার করে দিয়েছিল ক্লাব থেকে।

ওর ধারণা এর পেছনে দিগেনের হাত। দিগেন বহুবার ওকে ঠুকেছে। ভাল হবার কথা বলেছে, এমন কি শাষিয়েছে পর্যন্ত দরকার হলে দেখে নেবে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের আবছা আঁধারে পালেদের লণ্ড্রির সামনে আটকায় দিগেনকে—এই দিগাদা শোন।

দিগেন ডিউটি থেকে ফিরছিল! টুনুর ডাক শুনে এগিয়ে আসে, কি বলছো?

তোমরা নাকি আমাকে ইউনিট থেকে নাম কেটে দিয়েছ?

—হ্যাঁ দিয়েছি। কিন্তু রাস্তাটা কি জিজ্ঞেস করার জায়গা নাকি? তোমার কিছু বলার থাকলে ইউনিটে এসো। আর আমি একা কাটিনি। সকলেরই সিদ্ধান্ত ওটা।

—শোন, ওসব ইউনিট টিউনিট সিদ্ধান্ত টিদ্ধান্ত বুঝিনা। ওটাতো টাকা মারার আড্ডাখানা। ওখানে আমি যাবোনা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমাকে যারা তাড়িয়েছে তাদের কাউকেই আমি ছাড়বনা!

—বেশ, ছেড়োনা। যা পারো করো। কিন্তু এখন আমাকে ছাড়ো। এ সব কথাবার্তা রাস্তা ঘাটে হয় না। তা ছাড়া এটা কোন দেশী ভদ্রতা রাস্তায় আটকানো? সরো দেখি।

—না তোমাকে ছাড়া হবে না। তোমাকে বলে যেতে হবে আমার নামে কারা কারা লাগিয়েছে।

—যদি না বলি? বলেই চারদিকটা একবার দেখে নেয় দিগেন। বুঝতে পারে টুনু তৈরী হয়েই এসেছে। পাশের ট্যারা ছোঁড়াটা চুইংগাম চিবুচ্ছে। ক্রমশঃই ও লম্বা পা ফেলে সেঁটে আসে।

তোমাকে বলতে হবে!

—আচ্ছা! তার মানে গায়ের জোর!

—তা যা বোঝ! নাম না বলে যেতে পারবে না এই বলে দিলাম।

দিগেন একটু ভাবলো। গণ্ডগোল পাকাবে বলে এরা যখন ঠিক করেছে তখন তা করবেই। পায়ে পা দিয়ে হলেও করবে। সুতরাং বুঝতে পারলো তর্ক করে লাভ নেই। দরকার হলে মোকাবেলা করতেও হবে। দিগেন এরপর আর কোন কথা না বলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন ওর টিফিন ক্যারিয়ারটা টেনে ধরে। কপাল কুঁচকে ওঠে দিগেনের, ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে। ঝুঁকি নেবে কিনা ভাবছে। ছাত্রজীবনের অভ্যাসটা এই বিপদের মধ্যেই মনে মনে আউড়ে নেয়। আক্রমণ রুখতে গেলে অবস্থা বুঝে প্রথমেই আক্রমণ করে বসো। প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিও না, দিলে শুধু আত্মরক্ষাই করতে হবে! পাল্টা আক্রমণে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা কঠিন কাজ তখন।

দিগেন আর অপেক্ষা করেনা, হ্যাঁচকা টানে টিফিন ক্যারিয়ারটা ছিনিয়ে নেয়। দু পা পেছনে সরে আসে। টুনু ঠিক আক্রমণ করতে যাবার আগেই দিগেনের সাত পাউণ্ড ওজনের ঘুষিটা এসে মুখটা একদম থেঁতলে দেয়।

ছিটকে গিয়ে পড়ে টুনু। ট্যারা ছোকরাটা ততক্ষণে কোমর থেকে বেলট খুলে নিয়েছে। লক্ষ্য রেখেছে দিগেন। ছোকরাটা দিগেনের মাথা লক্ষ্য করার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। টেনে নেয় কোমর বন্ধটা। সাঁই সাঁই করে দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোরাতে থাকে। ততক্ষণে যথেষ্ট ভীড় জমে গেছে। লোকোশেডের প্রথম সিফটের মজদুর ভাইরা ফিরছে। দিগেনের সঙ্গেই কাজ করে এমন একজন ফিটার দিগেনকে দূর থেকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে থাকে। ইশারা করে সবাইকে তাকে অনুসরণ করতে বলে।

টুনু বুঝতে পারে অবস্থাটা ঘোরাল হয়ে উঠছে। তড়িৎ গতিতে ডেকে বলে, এই শালা ট্যারা ভাগ। ওই দেখ।

ট্যারা ছোকরাটা পড়ি-মড়ি করে দে ছুট। বাকী ক'টাও কেটে

পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যায়। ওদের দলটা ছিটিয়ে পড়ে এদিক ওদিক।

মিস্ত্রিটি ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে! দিগেন তাকে লক্ষ্য করে বলে, বড় জোর বেঁচে গেছি। বেটারা আজ ঠিক পেড়ে ফেলত।

মিস্ত্রি ঔৎসুক্য নিয়ে জানতে চায় ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? উকিলের ছেলেটাকে দেখলাম।

—তবে আর বল কেন? সব মস্তান হয়ে গ্যাছে। দল করেছে। টুনু ঘোষের দল। ইউনিট থেকে বার করে দেওয়ার জন্যে বদলা নিতে এসেছিল। এবার আর কোনদিন চেষ্টা করবে না। বুঝলে না, যা একটা কষেছি না, এখন বহুদিন মনে থাকবে।

দিগেন আর অন্যান্য লোকোর স্টাফ যা জমায়েত হয়েছিল, ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরমুখো এগিয়ে চললো।

সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল টুনু ঘোষ। কিন্তু ক্ষেপে গিয়েছিল। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিল, ওই শালার লাশ না ফেলতে পারলে ওর বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।

এরপর থেকে তক্কে তক্কে থাকে সর্বদাই। কিন্তু দিগেন কোন সুযোগ দিতেই রাজী নয়।

সম্ভবত সে রাগ তার এখনও কাটেনি। স্বভাবতই এখন সুযোগ নিচ্ছে টুনু ঘোষের মস্তান পার্টি। সেই যে কোম্বিং অপারেশনের সময় বেরিয়ে এসেছিল আজও এলাকায় ফিরতে পারছে না দিগেন। এলেও রাতের বেলা লুকিয়ে ছাপিয়ে যাতায়াত করে! ডিউটিতেও সাসপেণ্ড করে রেখেছে। কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখে দিগেন বোস সাসপেণ্ডেড। কিন্তু কি ব্যাপার, কি কারণ কিছুই সে জানে না।

বাড়ীতে ফিরেই দীপু কোনরকমে চপ্পলটা খুলে বিছানায় উবু হয়ে ফোঁপাতে থাকে। সুনন্দা লক্ষ্য করেন। এতক্ষণ শ্বশুরকে

বিছানায় হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলেন। মেয়েকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছেরে দীপু ?

দীপু কোন কথা না বলে তেমনি ফোঁপাতে থাকে।

সুনন্দা কাছে সরে আসেন, মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করেন, বল না কি হয়েছে ?

অন্য সময় হলে মায়ের সস্নেহ ছোঁয়ায় নিশ্চয় গলে যেত। কিন্তু টুনুর ব্যাপারটা ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। মনে মনে ভাবছিল এর একটা বিহিত চাই-ই ! মায়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে তেমনিই পড়ে থাকে।

সুনন্দা কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। তাই আরও একবার প্রশ্ন করেন, কেন, কাঁদছিস কেন বল ? কি হয়েছে কি তোর ?

এক ঝটকায় উঠে পড়ে দীপু, কিছু হয়নি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও দিকিনি।

সুনন্দা হতভম্ব হয়ে পড়েন। শান্ত মেয়েটা এর আগে কোনদিন ঠিক এমনভাবে মুখের উপর জবাব দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। অথচ আজ হল কি ? সুনন্দা কিছু বলবার আগেই দীপু মাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করে, শিবু কই মা ? আমি একবার উকিলবাবুর বাড়ী যাব।

—উকিল বাবুর বাড়ী ? কিন্তু কেন ?

—তুমি বলোনা শিবু কই ? তুমি সে সব বুঝবে না। আমি একবার নিজে নরেশ বাবুর সঙ্গে কথা বলবই ! দীপু এত জোর দিয়ে কথা শেষ করে যে সুনন্দা বুঝতে পারেন দীপুকে কোন রকমেই থামান যাবে না। দীপু মার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলোনা শিবু কই ?

—ওর জন্যে বিড়ি আনতে গ্যাছে। এখুনি আসবে।

দীপু উঠে চোখ মুছে ফেলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার মুখটা দেখে নেয়। পায়ের নীচের দিকে কাপড়টা টেনে ঠিক-ঠাক

করে নিয়ে চটি পায়ে গলায়, চৌকাঠ পেরুতে পেরুতে বলে, ও এলে একবার পাঠিয়ে দেবে রেণুদের বাড়ী। আমি যাচ্ছি!

আসলে দীপু অপেক্ষা করতে রাজী নয়। উত্তেজনা থাকতে থাকতে না হলে আর বলা হবে না। যে সাহস এই মাত্র এসেছে থিতিয়ে গেলে তখন হয়তো সেই সাহস আর নাও থাকতে পারে।

নরেশ বাবুর বাড়ীটা ওদের বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে। রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তারপর বুক উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেওয়ালে উপরে আবার বাঁকান কাঁটা তারের বেড়া। সামনের দিকটা একতলা অনেকটা বাংলো প্যাটার্নের, খানিক ছেড়ে অন্দর মহল দু'তালা।

দরজাটা প্রায়ই ভেজানো থাকে। ডান পাশে মটর গ্যারেজটার বাঁ দিকে মস্ত আম গাছ। গোল জলের ফোয়ারা থাকলেও প্রায়ই শুকনো থাকে। বাগানের সব কিছুই সাজানো। কিন্তু পরিশ্রমের কোন লক্ষণ নেই। অনেকটা দায়সারা গোছের।

দুর-দুর বুকে দীপু বাইরের দরজা পেরিয়ে ভেতরের দিকে পা দিতেই মস্ত একটা কুকুর অনেকটা চিড়িয়াখানায় দেখা বাঘের মতো বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দে উঠে দাঁড়ায়।

দীপু একটু থমকে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে কে একজন যেন কুকুরটার নাম ধরে ডাকে, এই জিমি, চুপ!

দীপু লক্ষ্য করে কুকুরটা ছাড়া নেই। বুকের কাঁপুনি অনেকটা থেমে যায়। চারধারটা আরও একবার দেখে নিয়ে জলের ফোয়ারাটা ঘুরে সামনের বৈঠকখানার দরজার চৌকাটে পা দেয়। প্রথমেই দেওয়াল ঘড়িটার উপর নজর পড়ে। এই ঘড়িটাই ওদের জানালা দিয়ে দেখা যায়। ঝুঁকে মুখটা বাড়িয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করে খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে কেউ আছে কিনা।

দিনের বেলাতেও একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালানো। নরেশ বাবু নিচু হয়ে বই দেখছিলেন। কিন্তু তাতেও, মুখ না তুলেই যেন

দেখতে পেলেন দীপুকে, কোন রকম নড়ানড়ি না করেই সম্মতি জানালেন, এসো ভেতরে। কাকে চাই। বেশ ভরাট গলা। সাদাসিধে মানুষটা, হাঁটু অবধি খদ্দরের ধুতি পরেন, গায়ে ফতুয়া। এমনকি কোর্টে যাবার সময়ও স্বদেশী বাপ্তার প্যাণ্ট আর কালো খদ্দরের কোট।

দীপু সাহস করে এগিয়ে যায়। কাছে যেতেই তিনি মুখ তোলেন, কাকে চাই মা?

দীপু কি বলবে, কি বলবে ভাবছিল। এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে রিহার্সেল দিয়েছিল নরেশ বাবুর মরার মতো শান্ত চাহনির সঙ্গে সঙ্গে যেন সব গুলিয়ে যায়। কিছু না বলে তেমনি টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে ডলতে থাকে। মুখ আনত!

আরও স্পষ্টভাবে তাকান নরেশ বাবু, দীপুর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, যেন তিনি সব কিছুই বুঝে ফেলতে পেরেছেন, তেমনি সহজ ভাবে আবার জিজ্ঞেস করেন, কাকে চাই বলো!

এতক্ষণে দীপু অনেকটা সাহস ফিরে পায়। বুকের ভেতরের হিম হিম ভাবটা কেটে এসেছে। আমতা আমতা করে বলে, আমি মানে, আপনার কাছেই এসেছি!

—ও আমার কাছে। বসো, বসো। সামনের চেয়ারটা চোখ দিয়ে দেখিয়ে দেন। তারপর দীপুর দিকে তাকিয়ে বলেন, বসো, ভালভাবে বসে নিয়ে বলো!

দীপু বসতে ইতস্ততঃ করে বলে, না মানে আমি বসব না। কিন্তু দেখুন, বলতে বলতে কেমন যেন আটকে যায় দীপুর!

নরেশ বাবু উৎসাহিত করেন, বলো ভয় কি? যা বলার তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।

দীপু সটান চোখ তোলে। নরেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কলেজ থেকে,....মানে বাথরোডে রোজ আমায় যা-তা বলে!

রাস্তা আটকায়। আমি কিছুতেই কলেজ থেকে ফিরতে পারিনা। কিন্তু কেন বলুন তো? আমরা হতে পারি গরীব। কিন্তু আমি তো ওনার কোন ক্ষতি করিনি!

নরেশ বাবু বুঝতে পারলেন মেয়েটি ঘাবড়ে গেছে। কোন কিছুই তাই গুছিয়ে বলতে পারছে না। তিনি তাই ওকে সাহস জোগাবার জন্য উৎসাহিত করে তোলেন, কি অত ঘাবড়াবার আছে? তুমি কলেজে পড়া মেয়ে বলছ, আর কি ঘটেছে স্পষ্ট করে বলতে পারনা? বলে ফেল, নির্ভয়ে বলে ফেল, তারপর দেখছি আমি কি করতে পারি।

দীপুর বুঝি এবার সত্যিই সাহস বেড়ে যায়। গড় গড় করে আজ বিকেলে ফেরার পথে যা যা ঘটেছে সব বলে ফেলে! মুখের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, নরেশ বাবু কি ভাবে নিচ্ছেন, আদৌ শুনছেন কিনা লক্ষ্য না করেই দীপু সব বলে যায়। বলতে বলতে যেন আবেগ এসে গেছে। শেষ পর্যন্ত এই বলে শেষ করে, আপনি আমার বাবার মতো, আপনিই বলুন না কেউ যদি রোজ রোজ আপনার মেয়েকে এভাবে জ্বালাতো আপনি কি করতেন? আপনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা নিতেন। নিতেন না-কি? তাই বলছি আপনি আমাকে এর হাত থেকে বাঁচান।

নরেশ বাবু যেমন ভাবে কোন মক্কেলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন ঠিক তেমনি ভাবেই শুনলেন। একটু নড়লেন না, একটু শব্দ পর্যন্ত করলেন না! দীপু থামতেই তিনি বললেন, এবার তুমি বসো!

দীপুর বসার দরকার ছিল। কারণ এত হাঁপিয়ে গিয়েছিল যে ওর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন!

নরেশ বাবু তাঁর ঠাণ্ডা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় থাকো বল দিকিনি? মুখটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—নামোপাড়া!

—রাস্তার ওধারটাই তো নামোপাড়া, বড় ড্রেনটার ওধারটা? চারু বাবু....?

—উনি আমার বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা! তাই বলো। তাইতেই তোমাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তারপর তোমার বাবা এখন কেমন আছেন বলো? ভুল করে মিছি মিছি কি ঝঞ্চটাই না পোহাতে হল! দোষ নেই, ত্রুটি নেই!

—দেখুন না!

—তোমার দাদা এখন কোথায় আছেন? দিগেন তোমার দাদা নয়?

—হ্যাঁ। কোথায় আছেন জানিনে। বাড়ীতে আসতে পারছেন না অনেকদিন ধরে।

—সেকি?

—তাইতো চলছে। একমাস ধরে কোথায় আছেন আমরা কিছু জানিনে। আসলে দীপু তা জানে। মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ীতে আসে ও। কিন্তু বলতে মানা।

নরেশ বাবু যেন অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছেন! এই অবস্থার জন্যে তিনি দুঃখিত। প্রকৃতই যেন তিনি ওদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল। গলায় তেমনি আফশোষের সুর ফুটিয়ে বলেন, সত্যি তোমাদের খুব বিচ্ছিরি সময় যাচ্ছে! কিন্তু কি করবে বলো। ভাগ্যের ফের। কখন যে কার উপর কি ভাবে নেমে আসে কিছু বলা যায় না! যায় কি? তুমি কি বলো?

দীপু মাথা নাড়ে!

নরেশ বাবু এতক্ষণে বইটা বন্ধ করলেন। যেখানে পড়ছিলেন হাতের কলমটা তার ভেতরে রেখে দাগ দেওয়ার কাজটা সারলেন। একটু আয়াস করবার জন্যে পেছনের দিকে হেলান দিয়েই আবার টান টান হয়ে বসেন। পুরু লেন্সের চশমাটা অভ্যাস মতো বাঁ হাত

দিয়ে ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করেন, তা হলে তোমাদের সংসার তো চলছে একমাত্র বাবার আয়ের উপরই, নয় ?

—হ্যাঁ।

—তোমার কলেজ কখন ?

—দিনের বেলায়।

—আমাদের রেণুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

—না তেমন নেই। তবে জানি রেণু আপনার মেয়ে।

—হ্যাঁ, মেয়ে তো বটেই। শুধু মেয়ে বললে ভুল বলা হবে। ও আমার মায়ের মতো। যখনকার যা দরকার ঠিক সময়টিতে এনে হাজির। ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে সব ভার ওর ওপর। বসো, ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল ও কলেজে পড়ুক। কিন্তু নিজেই রাজী হলো না।

বলেই তিনি বেশ জোর গলায় ডাকলেন, এই কে আছিস ? জীবন আছিস ? মা-মণিকে একটু ডেকে দে তো।

ডাক শুনে বুড়ো মতো জীবন ভেতরে এলো। দেখেই মনে হবে বহুদিনের পুরনো লোক। বাড়ীর কাজকর্ম সব দেখাশোনা করে থাকে। জীবন না হলে এ বাড়ীর সম্ভবত সব অচল। ঢুকেই প্রশ্ন করে, কি বলছিলে ?

—মা-মণিকে একটু ডেকে দিতে বলছিলাম।

বলেছিলে তো বটে। ওকি এখন ঘরে থাকে নাকি ? রোজ এ সময়ে গাড়ী নিয়ে বাজারে যায় না ?

—ও হো, একদম ভুলে গিছলুম। সত্যিতো, এটা ওর রোজকার মার্কেটিং-এর সময়। আচ্ছা আরেকদিন পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে কি বলো ? কিংবা যদি একটু বসো।

দীপু এতক্ষণ সম্মোহিতের মতো সব শুনে যাচ্ছিল। নরেশ বাবুর শেষ কথাটা কানে যেতেই উঠে দাঁড়ায়, না আর আমার বসা চলবে না। এরপর আমার অনেক কাজ ! আমি চলি !

—যাবে? বেশ! এসো মাঝে মধ্যে কেমন! তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ লাগলো!

দীপু কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। টেবিলের উপর বিছানো কাঁচটা ঘসতে থাকে! কিছু বলার ইচ্ছে নিয়ে নরেন বাবুর চোখের দিকে নয়, মাথার উপর ঝোলান ঘড়িটার দিকে নজর রেখে বলে, আমি যাই!

যাবে? বেশ, এসো মা এসো—বলেই অনুমতি দেবার জন্য ঘাড় নাড়তেই দেখেন দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

নরেশবাবু আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন, তলোয়ারটা দেখছ নিশ্চয়। আসলে তলোয়ারটা নয়! ওর খাপটা লক্ষ্য কর। ভারি সুন্দর নয়? ওই চামড়ার খাপটা দেখেই সংগ্রহ করেছিলাম। খাপটার উপর গান্ধীজীর ছবিটা কি সুন্দর এঁকেছে না?

দীপুর লক্ষ্য কিন্তু ওদিকে ছিল না। আসলে নরেশবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে চেয়েছে। নরেশবাবুর বলার পর ভাল করে নজর দেয়।

নরেশবাবু মৃদু হেসে বলেন, এটা আমার সখের ব্যাপার। তাই ওটা এখানেই রাখি। যে দেখে সেই অবাক হয়। ছবিটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার, কি বলো?

—হ্যাঁ। দীপু মাথা নাড়ে।

আসলে দীপু যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হল না। ভেবেছিল বেশ কড়া করে দু কথা শুনিয়ে দেবে। তারপর জানতে চাইবে বাপ হিসেবে তিনি কি করছেন তা তিনি বলুন! কিন্তু কি হলো? এত যে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসা। তিনি তো তার ছেলের সম্বন্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। পরন্তু এমন সুন্দর ব্যবহার করলেন দীপুর কিছুই বলার থাকলো না। আশ্চর্য ব্যাপার। দুর, নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে ওঠে দীপু, যতো সব শুকনো

সহানুভূতি। ছেলে তো তৈরী করেছেন একটা বুনো শূয়ার। অথচ দীপু কৈফিয়ত চাইতে পারল না।

বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে এল দীপু।

শিবু কখন এসে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু এলসেসিয়ান দেখে আর এগুবার সাহস করেনি। ঠায় ওখানে দাঁড়িয়েই নখ খুঁটছিল। এক পা থেকে অন্য পায়ে ভার বদল করছিল। মনে মনে দিদিকে মরবার জন্য গালাগালি পর্যন্ত দিয়ে ফেললে।

দিদিকে দেখেই ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, শেষ পর্যন্ত হলো তাহলে! কি হলো চাকরি নাকি? বাবারে-বাবা! যত রাজ্যের গল্প সব সেরে এলিতো?

দীপু কোন কথাই বলেনা! মৃদু মৃদু হাসে। হাসি দেখে শিবুর গা জ্বলতে থাকে। গুম হয়ে পাশাপাশি চলতে থাকে।

দীপু ভাইর দিকে লক্ষ্য করে বলে, তুই কখন এসেছিস?

—অনেকক্ষণ। তোর জন্যে আজকে আমার খেলাটাই গেল।

—কেন খেলতে চলে গেলেই পারতিস।

—তা পারতাম। কিন্তু মা জোর করে পাঠিয়ে দিল, দেখে এসো শ্রীমতী আবার ওখানে কি করছেন!

দুজনেই গেট পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগোয়। এক ফালি মাঠের ঠিক মাঝখানেই একটা ইউক্যালিপটাস। সিধে উপর দিকে উঠে গেছে। পাশ দিয়ে পেরুতে পেরুতে বলে শিবু, তুই আসার একটু পরেই সুদীপ্তদা এসেছেন! মাকে যেন কি বলাবলি করছিলেন, লোকটা নাকি ভাল না। তোর আসা উচিত নয়, আরও কত কি!

দীপু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মা কি বলল?

—কিছুনা। চুপ করে শুধু শুনলো। ব্যস, তার পরেই রুটি আর তরকারি! আচ্ছা দিদি, সুদীপ্তদা মাঝে মাঝে অমন রেগে যায় কেন বল দিকিনি? সবাইকেই তো কেবল বকে!

—কে জানে। হয়তো সবাই দোষ করছে। কিংবা এই রকমই।

—হ্যাঁ, তাই আবার হয়নাকি, সবাই দৈপুদাষ সু করবে দদাই কেবল রাইট ?

—অতো জানিনে যা। কেবল সারা রাস্তা ঘ্যানঘ্যান।

মাঠটা আড়াআড়ি পেরুলেও কাটা ড্রেনটা ডিঙ্গিয়েই বড় রাস্তায় উঠতে হয়। এরপর বাঁদিকের গলিটা দিয়ে এগিয়ে ঘুরে ওদের বাড়ীর সামনের দিকটা। দীপুদের বাড়ীটার পেছন দিকেই বড় রাস্তাটা। আসলে নামোপাড়ার এটাই পেছন দিক এবং বড় রাস্তাটাই সীমানা।

ততক্ষণে সুনন্দার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে বসেই কথাবার্তাসুদীপ্ত বলছিল। দীপু আর শিবু ঢুকতেই উঠে এলো সুদীপ্ত বড় ঘরে। শিবু আবার মায়ের কাছে গিয়ে রুটির বাটি টেনে নিল। সুনন্দা চায়ের কেটলিটা বসিয়ে দিলেন। দাদু তেমনি দাওয়ায় বসে আনমনে বিড়বিড় করেন, কে এলি ? দিগা এলি ?

দীপু বড় ঘরে না ঢুকে দাদুর পাশেই বসলো। বলল, না আমি দীপু। সুদীপ্ত ঘর থেকেই জিজ্ঞেস করে, যুদ্ধ জয় হয়ে গেল ?

দীপু হাসে।

সুদীপ্ত অসন্তুষ্টের সুরে বলে, তোমরা যে ওই লোকগুলোকে কি ভাব কে জানে ?

দীপু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে, তুমি কিন্তু অনেকদিন পর এলে সুদীপ্তদা।

—হ্যাঁ তা এলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছিল ?

—ও ঠিক হয়ে যাবে। দীপু এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি এড়িয়ে যেতে চায়। কি হবে আর সকলকে বলে : দেখাই যাক না নরেশ উকিল কি করেন ? সুদীপ্তের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কিন্তু অনেক দিন পরে এলে। এত দিন কোথা ছিলে বলতো ?

—চাঁদে।

—তাই নাকি ? রকেট ভাড়া কে জোগাল ?

—কে জোগাবে আবার। জানতো, যে খায় চিনি জোগায় চিন্তামণি। আজকাল আবার ফিনানসিয়ারের অভাব আছে নাকি ? কালো টাকার তো ছড়াছড়ি। খরচ করার জায়গা দরকার মাত্র। যেতে চাইলে তোমার ভাড়াও যোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বলতো তোমাদের কলেজে ছ' তারিখ ষ্ট্রাইক হয়েছিল ? ওটা আমাদের জানা দরকার।

—হ্যাঁ ! আগে থেকেই নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল ! আচ্ছা সুদীপ্তদা, মাষ্টার মশাইকে কি সত্যিই পুড়িয়ে মেরেছিল ?

—সত্যিই নয়তো মিথ্যে নাকি। তোমার কি মনে হয় মিথ্যে ?

—না তা নয়। ভাবছি, এটা সম্ভব কিনা ! কি করে পারলো ? একটা স্কুলের হেডমাষ্টার, তাকে কোন সভ্যজগতে দিনের বেলায় পুড়িয়ে মেরেছে এটা বিশ্বাস করতে সত্যি তো অবাস্তব মনে হবে।

—তা হবে। কিন্তু আমরা সভ্যজগতে বাস করছি কিনা তা দেখতে হবে তো ! আশ্চর্য ! প্রথমে অবশ্য আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। খবরটা শোনামাত্রই চমকে উঠেছিলাম। বিপিনদা অফিসে বসেছিলেন, ফোনে যখন খবরটা আসে, হঠাৎ তিনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে ফোনটোন ছুঁড়ে ওই অবশ পা নিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে গিছলেন। কি তীব্র ঘৃণা তাঁর চোখে ! আমরা সুদ্ধ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরক্ষণেই নেতিয়ে পড়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে অপলক ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের দু কোণ বেয়ে দরদর করে জল গড়াচ্ছিল। ঘরের এতগুলো মানুষ কেউ কথা বলতে পারেনি। আমরাও সেই মুহূর্তে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি কি করা যাবে ব্যাপারটা নিয়ে। বিপিনদাই বললেন, কালই মহকুমা বন্‌ধ ডেকে দাও। এত বড় একটা ব্যাপার বিনা প্রতিবাদে যেতে দেওয়া যায়না।

নিজের অজান্তেই বলতে বলতে ভারাক্রান্ত হয়ে আসে সুদীপ্তর

গলার স্বর। দীপুকে লক্ষ্য করে বলে, সত্যিই এর জন্যে আমরা তৈরী ছিলাম না দীপু! কি যে হয়ে গেল!

দীপু চুপ করে শুনেই যাচ্ছিল। কোন মন্তব্য করার ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছে। সুদীপ্তকে চোখ মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করে, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

—প্রতিকার? প্রতিকার তো নিশ্চয় আছে। সাময়িকভাবে খানিকটা বিহ্বলতা তো দেখা দেবেই। তৈরী মানুষ হচ্ছে। আজ যা ঘটান হচ্ছে আগামী কাল তা কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দেওয়া হবে।

দীপু লক্ষ্য করেনি। শিবু কখন এসে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে, ছ' তারিখ আমাদের স্কুলেও ষ্ট্রাইক হয়েছে। পরদিন স্কুলে শোকসভাও হয়েছিল। হেডমাষ্টার মশাই বক্তৃতা দিতে দিতে ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। কি যেন একটা ইংরেজী বললেন, ইউ আর লিভিং যাষ্ট আণ্ডার এ টেররিষ্ট রেজিম। টেররিষ্ট রেজিম মানে কি সুদীপ্তদা?

—সন্ত্রাসের রাজ্য। সাধারণ মানুষের যেখানে কোন নিরাপত্তা নেই এমনি রাজ্য। সুনন্দা কোন এক ফাঁকে চা দিয়ে গিয়েছিলেন। সুদীপ্ত চা খেতে ভুলে গিয়েছিল। রান্নাঘর থেকেই তা লক্ষ্য করেন সুনন্দা। ওখান থেকেই হেঁকে বলেন, কি তোদের অত বক্তৃতে হচ্ছে কে জানে? সুদীপ্ত তুমি চা খেয়ে নাও।

—হ্যাঁ খাই মাসীমা।

বিমান মাষ্টার মশাইর প্রসঙ্গ আসতে পরিবেশটা সত্যিই কেমন যেন থমথমে হয়ে ওঠে। শুধু সুদীপ্ত কেন, চা দীপুও খেতে পারেনি। পারেনা কেউ খেতে এমন একটা প্রসঙ্গ এসে গেলে। যত মিষ্টিই হোকনা কেন, সব বুঝি নিমেষের মধ্যে তেতো হয়ে যায়।

অথচ আদৌ কোন অপরাধ ছিলনা বিমান দাশগুপ্তের।

আজীবন মাষ্টারি করে এসেছেন। কোন্ সেই সাতাশ বছর বয়সে প্রথম শুরু করেছিলেন! একটানা একুশ বছর। তার মধ্যে কোন ছেদ নেই, বিরতি নেই!

অন্য দিনের মতোই স্কুল বসার ঘণ্টা খানেক আগেই সেদিনও স্কুলে এসেছিলেন। অফিসে বসে অভ্যাসমত নিজেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে নেন। তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দেন।

বাইরে কারা যেন শ্লোগান দিতে থাকে। স্পষ্ট শুনতে পান না তিনি। উঠে আসেন নিজের চেয়ার ছেড়ে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে তাকান সামনের দিকে। প্রথমে ঝাপসা ঝাপসা কিছুই বুঝতে পারেন না। ক্রমশঃ এগিয়ে আসে ওরা। এবার লক্ষ্য করেন গোটা আটদশের একটা দল। সকলেই চোঙা প্যাণ্ট, কালো চশমা পরা। চেহারাগুলো কেমন যেন ঢ্যাঙা খাঁচের।

শুধু সরু সরু পাছা দুলিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে, পরীক্ষা নেওয়া, চলবে না, চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়ান বিমান মাষ্টার মশাই।

আবার শ্লোগান, আমাদের দাবী মানতে হবে, বই দেখে টুকতে দিতে হবে।

বিমান মাষ্টার মশাই দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করেন, কে আপনারা? আপনারা তো আমাদের ছাত্র নন।

হিসিয়ে ওঠে ওদের মধ্যে একটা ছেলে, না আমরা কেউ তোমার ছাত্র নই। কিন্তু আমরা বলছি তোমার শালা পরীক্ষা নেওয়া চলবে না।

পরীক্ষা আমি বন্ধ করতে পারবো না। এটা অন্যায় আবদার।

শালা আমাদের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান দিচ্ছে রে! ধর শালাকে। বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাপটে ধরে দুটো চোঙা প্যাণ্ট। চোখের নিমেষে মাষ্টার মশাইকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। চটপট আরেকটা ছেলে পেট্রোলের টিনটা উপুড় করে ঢেলেদেয় সারা গায়ে।

বিমান দাশগুপ্ত চিৎকার করতে থাকেন সাহায্যের জন্যে, বাঁচাও, বাঁচাও! কিন্তু কে বাঁচাবে তাঁকে। আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন তিনি। অসহায় ভাবে চিৎকার করছেন, আপনারা কে আছেন, আমাকে বাঁচান। আপনারা দেখে যান সভ্য জগতের মানুষ, এরা কি ভাবে একজন শিক্ষককে পোড়াচ্ছে।

আপনারা দেখে যান, মানুষ গড়ার কারিগর আমি, আমাকে দিনের বেলায় এরা পুড়িয়ে মারছে।

আপনারা, আমার সঙ্গে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি সভ্যজগতে বাস করছি না গুহার যুগে ফিরে গেছি?........

আর কোন কথাই তিনি বলে যেতে পারেন নি। শুধু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে তীব্র ঘৃণায় বারবার তাঁর দেহ বেঁকে যাচ্ছিল। হাত দুটো উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে।

তিনি বাঁচেন নি।

এই বোধ হয়। এমনি করেই এক এক জন মানুষ নিজের জীবন দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে ইতিহাস রচনা করে যান। বিমান মাস্টার মশাই আর নেই কিন্তু বেঁচে থাকবে তাঁর ইতিহাস। তাঁর স্মৃতি। মানুষ একদিন নিশ্চয় আজকের এই ঘটনা লক্ষ্য করবে, তারপর তৈরী হবে তাদের ভবিষ্যৎ পথের জন্য। নিশ্চয় তারা এমন এক দুনিয়া তৈরী করবে যেখানে প্রাণের মূল্য সত্যি করেই নির্ধারিত হবে।

চা শেষ করে সুদীপ্ত উঠে দাঁড়ায়, এবার আমাকে যেতে হবে দীপু। অনেকক্ষণ হলো এসেছি। আঞ্চলিক অফিস থেকেই সোজা তোমাদের এখানে! তোমরা একটু সাবধানে থাকবে আর কি!

দীপু ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, এর মধ্যে দাদার সঙ্গে

আপনার দেখা হয়েছিল ? দাদার জন্যে দাদু কেমন করছে দেখছেন তো ? হয়েছিল দেখা ?

—দেখা ? তা তো বলা নিষেধ ! কিন্তু শুধু তোমাকেই বলছি, দেখা হয়েছে ভাল আছে।

সুনন্দা উঠে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে আসতে পারবে কি ? যদি পারে তো বলো। কতদিন আসেনি ছেলেটা। কোথায় আছে কি খাচ্ছে কে জানে ? আর কতদিনই বা এমনি চলবে তাই বা কে বলবে ? বলতে বলতে শেষের দিকে সুনন্দার গলা বুজে আসে। চোখে আঁচল দিয়ে অমঙ্গল অশ্রু চাপতে চেষ্টা করেন। সুদীপ্ত সান্ত্বনা দেবার ছলে বলে, দুঃখ করে লাভ নেই মাসিমা। আপনার ছেলে তো আর একা নয়। কত মা, কত বৌ, কত বোন এমনি অপেক্ষা করে আছে সুদিনের জন্যে ! যে কাজে আমরা নেমেছি সে কাজ তো সহজ নয় মাসিমা। অনেক কষ্ট, অনেক পিছল পথ ধরে এগুতে হবে। অনেক কঠিন, কঠোর সংগ্রাম, অনেক অত্মত্যাগ। আপনারা ভেঙে পড়লে আমরা সাহস পাব কেন ? আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন সুদিন আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি।

সুনন্দা বলেন, সবই বুঝি বাবা, কিন্তু মন মানছে কই ? এটা কি আর বুঝিনা তোমরা লড়ছ দশজনের জন্যই। নিজেদের স্বার্থের জন্যে তো আর এসব করছনা। যা করছ, সব আমাদের জন্যেই। আর আশীর্বাদের কথা বলছ ? না, আশীর্বাদ তোমাদের করবনা, সে ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আশা করব তোমরাই এমন একদিন আনবে যখন অন্ততঃ বিমান মাষ্টার মশাইর মতো ঘটনা না ঘটতে পারে।

সুদীপ্ত সুনন্দাকে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে, এই না হলে মা ? স্নেহ আছে, মমতা আছে, প্রয়োজন বোধে আছে অসীম ধৈর্য আর দৃঢ় প্রত্যয়। সুনন্দার প্রতি সুদীপ্তের শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়। কিছুক্ষণ থেমে বলে, আজ আমি চলি মাসিমা।

দীপু সুদীপ্তকে এগিয়ে দেয়, বাড়ীর দরজা পেরিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করে, সন্ধ্যার পর একা একা এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে সুদীপ্তদা ?

—ঠিক তো নয়ই। কিন্তু আমি চলে যাব। আঞ্চলিক কমিটি এ বিষয়ে আমাদের বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছেন, দেখবেন কমরেড চোখটা কানটা সব সময়েই খুলে রাখবেন। এ ব্যাপারে বেশী হেলাফেরা করবেন না। বিপদ কিন্তু যে কোন দিক দিয়েই আসতে পারে। আচ্ছা, এবার তুমি ফের। আর কতদূর আসবে।

সুদীপ্ত এরপর চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। দীপু ঠায় তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ দেখা যায় সুদীপ্তকে। প্রথমে স্পষ্ট, তারপর আবছা, আবছা থেকে দেহটা ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এক সময়ে একেবারে মিলিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে দীপুর বুক থেকে। সত্যিই আশ্চর্য মানুষগুলো। কি খেল, কোথায় খেল, খেল কি খেলনা, ঘুমুতে পারলো কি পারলোনা কোন ভাবনা নেই। প্রয়োজন পড়লেই ছুটলো কঠিন বিপদকে তুচ্ছ করে নির্দেশ মতো। জীবনের ঝুঁকি আছে ? থাক ঝুঁকি, কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা করা চলবেনা। এই একনিষ্ঠতাই দীপুকে ওদের শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

সুদীপ্ত এলে দীপুর ভাল লাগে। কিন্তু কেন ভাল লাগে বলতে পারবেনা। সুদীপ্ত দাদার মতো বলিষ্ঠ নয়। একটু ছিমছাম। কথাবার্তাও সংযত এবং মাপাজোখা। প্রথম যেদিন এসেছিল দাদার সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দীপুকে, কমরেড সুদীপ্ত আর আমার ছোট বোন দীপ্তি, সবাই ডাকে দীপু বলে! তোদের দুজনের নামের মধ্যে কেমন একটা মিল আছে নয় ?

দীপু লজ্জা পেয়েছিল ; সুদীপ্ত হেসেছিল।

সে সুদীর্ঘ তিন বছরের কথা। দীপুর হায়ার সেকেণ্ডারীর শেষ বৎসর সেটা। তারপর বহুবার এসেছে সুদীপ্ত। কখনও কাজে

দাদার কাছে, অবসর পেলে মাসিমা আর দীপুর কাছে। গল্প করেছে যতক্ষণ খুশী। প্রোগ্রাম থাকলে আবার দেখা করে সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের মতো চলে গিয়েছে। হোমে মানুষ সুদীপ্ত। মা বাবার কোন খোঁজ জানেনা। আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা জানেনা। সে জন্যে দুঃখও তার নেই। আজ বিশ্বজোড়া তার আত্মীয়।

দীপুর সবচেয়ে ভালো লাগে সুদীপ্তর কথাবার্তা, কেমন যেন অবশ করে আনে। শুনতে না চাইলেও শুনতে হয়। দোষের মধ্যে দোষ, যখন-তখন চটে যায়। আর চটে গেলেই তোতলাতে থাকে। একদম কথা বলতে পারে না।

আজ যে নরেশ বাবুদের বাড়ী যাওয়া নিয়ে বিশেষ কিছু বলে নি, এটাই ভাগ্য। প্রথম প্রথম কি ভয়ই না করছিল! একবার শুধু বলেছিল, ওই ফেমিলিটার সঙ্গে বেশী মেলামেশা ঠিক নয়! ওর একটা ছেলে আর রেল অফিসারের কয়েকটা ছেলে মিলে বেটারা গুণ্ডার দল খুলেছে। সমস্ত শহরটাই জ্বালিয়ে মারল। জ্বালিয়ে যে মারছে সে তো দীপু নিজেই জানে। সে অভিজ্ঞতা তো তার আছে। এবং সেই জ্বালানোর প্রতিকারের জন্যেই তো নরেশ উকিলের কাছে যাওয়া। কিন্তু দীপু এসব কিছুই জানালো না সুদীপ্তকে। অবশ্য সুদীপ্ত একথায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলতো এটা পদ্ধতি নয়। একা একা কিছু করা যায় না। এদের বিরুদ্ধে জিততে হলে চাই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, বুঝেছ? কিন্তু আজকের ঘটনাটা চেপে গিয়ে দীপু জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা সুদীপ্তদা, ওই কয়েকটা লোক সকলকে জ্বালিয়ে মারছে আর ওদের ঠাণ্ডা করা যায় না? শহরে কি পুলিশটুলিশ উঠে গেল?

সুদীপ্ত জোরে হেসে ওঠে, বলে, পুলিশ উঠবে কেন? পুলিশ আরও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কথাটা তা নয়, কথাটা হচ্ছে তোমরা জেনে শুনেও কেন এই সব প্রশ্ন করো? তোমার মতো

অনেকেই জিজ্ঞেস করে। আসলে কি তোমরা জানোনা পুলিশ নিজেই ওদের কাজে লাগাচ্ছে। যেখানে ওদের দ্বারা হচ্ছেনা সেখানে নিজেরাই সাদা পোশাকে নেমে পড়েছে। সাধারণ মানুষ কি বুঝতে পারছেনা শতশত বেআইনী পিস্তল, পাইপগান, এমন কি রাইফেল পর্যন্ত ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ?

দীপু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, কেন ?

—কেন ? প্রয়োজনে। এখন ওদের তাই দরকার। মানুষকে বেশী দিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় কি ? যায় না। ওদের চালটালগুলো আজকাল সব ধরে ফেলেছে। শুধু ধাপ্পায় আর ক'দিন চলবে ? টাকাপয়সার সংকটটা আজ এমন এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে চাইলেও ওদের কিছু করার নেই। তাই তাদের দরকার মানুষের ভালবাসা নয়, মানুষের শুধু শ্রমটা, বুঝেছো ? দরকার হলে একদিন পরিষ্কার ওরা চাবুকের ডগায় কাজ করাবে। আর আমরা যদি তা রুখতে না পারি তা হলে সেটা আসবেই। এবং টুনুর মতো ছোঁড়াদেরই প্রথম ব্যবহার করবে।

দীপু মুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুদীপ্তর কথাগুলি গিলছিল। শেষের কথাটা কানে যেতেই প্রশ্ন করে, তা হলে টুনুরা যত না বেশী দোষী, তাদের যারা ব্যবহার করবে তারাই তো আসল দোষী !

—সে তো বটেই। ওরা ওদের হাতে যন্ত্র আর কি ? আচ্ছা আর দেরি করতে পারছিনা দীপু। অনেকটা দেরি হয়ে গেল। তোমাদের এখানে এলেই যেতে আর মন চায় না। কিন্তু উপায় নেই। চলি।

শেড কমিটির সভা সেই থেকে চলছে। সভাটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। প্রথমেই সে কথা সকলের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। আলোচনার উরপই নির্ভর করবে আগামী দিনের পদক্ষেপ। সুতরাং সমস্ত দিকগুলো নিয়ে বিষদ আলোচনা চালাবার পরই যা হোক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সুদীর্ঘ কয়েক ঘন্টার আলোচনার পরও শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারলনা। অথচ সিদ্ধান্ত তাদের করতেই হবে।

কেদার কুণ্ডু তার পুরনো অভ্যাস মতোই আবারও চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু হলোটা কি ? উচিত বলে বহু বাতচিতই তো মারা হলো। কিন্তু শেষমেষ দাঁড়ালো কোথায় গিয়ে। আমরা তো যে গাড্ডায় ছিলাম সেখানেই রইলাম। অথচ এতক্ষণ ধরে তাহলে গ্যাঁজানোর কি দরকার ছিল ?

ভোলা পাণ্ডে ড্রিলিং মেসিনে কাজ করে। অতি ধীর স্থির। সূক্ষ্ম কাজ তার। এমনও ড্রিল মেসিন আছে যেখানে তাকে এক মিলিমিটারের কম অংশকে মেলাতে হয়। স্বভাবেও তার ছাপ। বয়সও যথেষ্ট। কানের কাছ থেকে মাথার মাঝামাঝি পর্যন্ত দু ধারেই চুল সব সাদা। সারা মাথায় বার দুই হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর কেদারকে লক্ষ্য করে বলেন, আরে বেটা, এত রেগে গেলে কি চলে ? গ্যাঁজানোর দরকার আছে। সব দিকটাই তো ভাবতে হবে। কি করা যাবে, কতদূর এগুনো যাবে সব ভাবতে হবে। চট করে শুরু করে দিলেই তো আর হবে না। তাকে শেষ তক টেনে নিয়ে যাওয়াটাই হল গিয়ে আসল। জয়টাতো সেখানেই।

ভোলা পাণ্ডের কথায় সভার চেহারাটা আবার পালটায়। গুনগুন, এর কথা, ওর কথা সব মিলিয়ে তালগোল পাকানো অবস্থাটা অনেকটা আয়ত্তে আসে।

দিগেন চুপ করেই ছিল, এবার সায় দেয়, হ্যাঁ ভোলাকা'র কথাই ঠিক। তা হলে এক কাজ করা যাক, স্ট্রাইক যখন করানো যাবেনা তখন আরও একবার ডেপুটেশনে যাওয়াই যাক।

পবিত্র কর লিডিং ফায়ারম্যান। গান্ধী প্যাটার্নের কালো টুপী একটা সব সময়ে মাথায় পরে থাকে। কথার পিঠে কথা দিয়ে মানুষকে হাসিয়ে মারে। তার মধ্যেই সিরিয়াস সিদ্ধান্তটাও অনেক

সময় ঘোষণা করে দেয়। দিগেনের কথাটা যেন প্রায় লুফেই নেয়; বলে হ্যাঁ, দিগাদার কথাটাই ঠিক। ঘেরাও, ধম্মোঘটটটু ওগুলো একটু কষ্টটষ্ট করে করতে হয়। দিনকাল এখন যা পড়েছে এখন ওগুলো বাদ দেওয়াই যাক। এখন শুধু সাহাবদের সঙ্গে টেবিলে বসে আইসক্রিম আর ভাইবন্দিতে বাতচিত। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সব মেনে লিবে। তারপর যখন আমাদের দিন আসবে তখন আবার ফিনছে ঘেরাও আর ধম্মোঘট হরতাল চালাব। তুমি কি বলো ভোলাকা?

ওর কথায় এ অবস্থায়ও সবাই হেসে ওঠে, বসন্ত দাস হাসতে হাসতে বলে, না পবিত্রদা, এখন হাসি ঠাট্টা রাখ। বেলা প্রায় একটা হতে চললো। সিদ্ধান্ত যাই হোক একটা করে ফেল। না হয় ওবেলা আবার বসা যাবে।

মুক্তাসিং বিরোধিতা করে, না না উবেলা-টেলা চলবেনা। এক্ষুণিই যা হোক বলে নিন। আর দরখাস্ত ডেপুটেশন যা দেবার তাতো অনেকবার দেওয়া হল। ওতে বেটাদের গা ঘামবেনা। আবার গা ঘামানোর ব্যবস্থাই করতে হবে। তিন-চার মাসতো হবেই, নাকি দিগাদা, কতদিন হলো?

—তিন মাস একুশ দিন।

—না আর কিছুতেই ফেলে রাখা চলবেনা। হয় ফয়সল্লা চাই নয়তো পবিত্তরদা হাসি মজাক্ যাই করুক, পবিত্রদার কথাই ঠিক। সব দাবীদাওয়াগুলো নিয়ে ডি. এস.-এর বাংলো ঘেরাও করাই ঠিক হবে। যতক্ষণ না ফয়সল্লা হবে কেউ উঠতে পারবেনা।

মুক্তাসিং-এর নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব আসতেই সভায় আবার একটা থমথমে ভাব দেখা দেয়। সবাই চুপ করে যায়। এটা করতে গেলে আদা জল খেয়ে লাগতে হবে। শেড কমিটির সবাইকে অন্ততঃ এক হপ্তা ধরে লাগাতর কলোনীগুলিতে পড়ে থাকতে হবে। যোগাযোগ করতে হবে অফিস, লোকো, আই.ও.ডব্ল্যু. ক্যারেজ-ওয়াগন

সমস্ত শেড আর অফিসগুলিতে। কারণ যা তা ফার্স করার ঝুঁকি কেউই নিতে রাজী নয়।

দিগেন চোখ তুলে সকলের দিকে একবার বুলিয়ে নেয়, তারপর বলে, কাজটা কিন্তু যত সোজা ভাবছ তত সোজা নয়। তার চেয়ে ডি. এম. ই-র চ্যাম্বার ঘেরাও করা যেতে পারে।

কেদার কুণ্ডু চিৎকার করে, ও শালা শূয়ারের বাচ্চার সঙ্গে দেখা করে কিস্সু হবে না। বেটা মাগীবাজ। ওয়াগন ভাঙাদের সঙ্গে বেটার হেভি সাট। কেন, প্রথম দিনেই আমাদের ঝেড়ে দেয়নি, ওর করার কিছু নেই, ওপর থেকে ফয়সল্লা হয়েছে। সেখানে আবার তার কাছে যাওয়া কেন?

আসলে দিগেন এইক্ষণে আরও কিছু মজদুরদের শিকার হতে দিতে রাজী নয়। বিপিনদার কথা মনে পড়ে গেল তার, তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এ সময়ে ওরা যত বেশী পারে মজদুর ছাঁটাই করবার সুযোগ খুঁজবে। সুতরাং, যাই করো সে দিকটা বাঁচিয়ে। একটা কথা মনে রেখো, ওদের অস্তিত্ব যদি বজায় রাখতে হয় তা হলে প্রথম আঘাত হানতে হবে এই তোমাদের মতো জঙ্গী মজদুরদের। আর সেটা করবে ওরা অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের শেষ অস্ত্র ফ্যাসিবাদ আনবার জন্যেই। সুতরাং পা ফেলতে হবে এখন গুণে গুণে।

দিগেন তবু একবার ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে, ডি. এম. ই-র কাছে আরও একবার যেতে চাওয়ার কারণটা তোমাদের বলি। ব্যাপারটা তোমরা চিন্তা করে দেখ। ধরো ডি. এস. এ-র কাছে গেলাম। তিনি হাঁকিয়ে দিলেন। তার পর কি হবে? তারপর কার কাছে যাওয়া হবে? সুতরাং, একটা সুযোগ রেখে দেওয়া আর কি! তা তোমরা ভেবে দেখো!

ভোলা পাণ্ডে বিঁড়িটা আস্তে আস্তে মেঝেতে ঘষে ঘষে নেভালেন। অভ্যাস বশেই মাথা চুলকে বললেন, দিগেন বেটার কথা

ঠিকই বটে। তবে সেটাইতো আখেরি নয়। ডি. এস.-র পর, জি. এম. আছে। খায়ের ও ভি ছোড়। ডি. এস. যদি কিছু নাই করে তো আমাদের আখেরি দাওয়াই বাতলাতেই হবে। তখন না হয় কয়েক ঘণ্টার জন্যে রেলকা চাক্কা বন্‌ধ্‌।

—তার পরও যদি ফয়সল্লা না হয়—পবিত্র কর আর মুক্তা সিংহ প্রায় এক সঙ্গেই বলে ওঠে!

দিগেন অবস্থাটা বুঝে ফেলে। একটা কিছু করতে চায়ই। শুধু দিগেনের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার ব্যাপারই তো নয়। আরও আঠার দফা দাবীদাওয়া আছে। মিশা আর পি. ভি. এ. আটক আছে। ছাপান্ন ঘণ্টার পর পুরা চব্বিশ ঘণ্টার রেষ্ট আছে। কোয়ার্টার, ওভারটাইম, চব্বিশ ঘণ্টার জলের লাইন, বাতির লাইন। রিলিভিং ষ্টাফের দেড়া ভাওয়ে ভাতা অফিসারদের কথায় কথায় গালি, গুণ্ডা বন্ধ। বদলীর নির্দেশ বাতিল আরও কত বলা না বলা সব বিষয়ের দাবীদার! সুতরাং মুক্তা সিংএর শেষ প্রস্তাবই সকলের পছন্দ।

সবচেয়ে বেশী জোর দিগেনের সাময়িক বরখাস্ত নির্দেশ বাতিল আর হপ্তায় ছাপ্পান্ন ঘণ্টার পর পুরা চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি।

সত্যিই এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। পবিত্র কর মজাকী করে হলেও ঠিকই বলে, বুঝলে কিনা ভায়ারা, আমরা হচ্ছি লেজওয়ালা যুগের আদমী। কোন্ সেই আঠারশ ছিয়াশী সালের বাদ তাগড়া লড়াই চালিয়ে তামাম দুনিয়া আট ঘণ্টা ডিউটী মানিয়ে লিলেক আর আমাদের কিনা বারো, চৌদ্দ তো বটেই, চাই কি চব্বিশ ঘণ্টাই মিশিন চালাও। আরে ভাই তগদিরের বাত বললে তো হাসতে হাসতে পেট ফুলে যাবে। গৌর দাকে তো সবাই জানো, লিডিং ফায়ারম্যান, শোন তবে গৌরদার কথা। সে গৌরদার বিয়ের বছর দুই বাদ হবে বোধ হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় শীতের দিনে গিয়ে দেখি গৌরদা লেপ চাপিয়ে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ইয়ার্কী করে এক টানে লেপ তুলতে যাব তো সঙ্গে সঙ্গে রসুই ঘর থেকে বৌদি খাঁ খাঁ করে ছুটে এলেন, না না ওটা তুলবেন না, কিছুতেই তুলবেন না। গৌরদারও ঘুম ভেঙে গেল, আমাকে দেখেই হা হয়ে গেলেন। লেপটা চেপে ধরে গৌর দা বললেন, ওটা তুলিস্ না ভাই!

—কিন্তু কি ব্যাপার? আমারও জেদ চেপে গেল। যত ওরা মানা করলো তত আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। এক সময় হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেললাম লেপটা। সত্যিই বলব কি ভাই। এর জন্যে বুঝি আমিও তৈরী ছিলাম না। দেখি কি জানো গৌরদা বিয়ের পাম্পসু পায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন!

বিব্রত হলেও গৌর দা বললেন, কি করি বল, সেই কবে বিয়েতে পেয়েছি, শালা এমনি টানা ডিউটী বিয়ের জুতোটা পরে যে দু এক ঘণ্টা বেড়াব সে সময় নেই। না পরলে ওটার শেপ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই একটু শেপটা ঠিক রাখা আর কি।

সুতরাং ডিউটীর ঘণ্টা কমাবার লড়াই ওদের একটা জোরদার লড়াই। দিগেন এরপর আর কোন কথা না বলে বললো, ঠিক আছে; তাহলে এটাই পাকা হয়ে গেল আগামী ২৯শে মে ডি. এস-কে বাংলোতে ঘেরাও করা হবে।

এক বাক্যে সবাই সায় দেয়, তাই হোক।

—বেশ তা করতে গেলে একবার কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে খবর দিতে হবে। সেটার ভার নিচ্ছি আমি। আর ভোলা বা তোমাকে দেখতে হবে ছয় নম্বর রেল কলোনী। মুক্তা সিং তুমি ট্রাফিক আর ওল্ডস্টেশন। মনে রেখো, আমরা কতটা সংগঠিত করতে পারছি তার উপরই নির্ভর করছে সব কিছু। কেদার, তুমি নিচ্ছ বড় কোয়ার্টার আর ওপেন টাইপ। পবিত্র ভাই তোমার হলো পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ড আর পাঁচ নম্বর। ব্যস, আমরা যদি আমাদের সব দায়িত্ব সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারি তা হলে আর দেখতে হবে না। দিগেন দায়িত্ব

বণ্টন করতে করতে একবার থামে। তারপর উন্মুক্ত বায়ু থেকে তাজা অক্সিজেন টেনে নিয়ে ফের শুরু করে, গুরু দায়িত্বের কথাটা আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি কমরেডস্। বসন্ত ভাই তুমি একবার বাণীর সঙ্গে দেখা করবে। রেল কলোনীর মহিলাদের মধ্যে মহিলা সমিতির প্রভাব যথেষ্ট। বাণী একটু চেষ্টা করলেই বহু মহিলাকেও সামিল করাতে পারবে। কিন্তু ওকে তো খবর দিতে হবে নিউ টাউনে।

বসন্ত দাস মাথা নেড়ে বলে, বৌকে বলে দিলেই হবে। তাছাড়া, আজ বোধ হয় ওদের একটা মিটিং আছে আঞ্চলিক অফিসে।

তাই নাকি? তাহলে তো ভালই হয়। আঞ্চলিক অফিসে আমিও থাকব। বিপিনদার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিতে হবে। দরকার হলে শেড কমিটির ফ্যাকসন-এর এই সিদ্ধান্ত উচ্চতর কমিটিকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেব।

ভোলা পাণ্ডে সায় দেয়, ওটা আরও ভালো হবে। ওদের ওয়াকিবহাল না করে একটা কিছু করার মধ্যে ঝুঁকি আছে। এবং সে ঝুঁকি আদৌ নেওয়া উচিত নয়।

বেলা প্রায় দুটোর সময় সভা শেষ হলো। পবিত্র কর বাজারের থলে নিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সভা ভেঙ্গে যাবে, যাবার পথে বাজার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হলো না। বাড়ীতে কিছু আছে কিনা কে জানে? যদি ব্যবস্থা কিছু না থাকে তো শনি লাগবে।

অসুবিধেটো যে শুধু তার স্ত্রীর একার তা তো নয়। তারও। লাইনে কখন কল হবে কে জানে? সব সময়েই ডাল, চাল, তরকারির ব্যবস্থা রাখা চাই। খানাবাক্সে করে ডিউটী যাবার সময় সব যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে। যেখানে ডিউটী শেষ হবে সেখানে রানিংরুমের ব্যবস্থা আছে। তাদের মালপত্তর দিলে খানা বানিয়ে দেয়।

বসন্ত দাস পবিত্র করের দিকে লক্ষ্য করে বলে, পবিত্রদার বাজার তাহলে আজকের মতো হলো!

—তা তো হলো ভাই, কিন্তু বাড়ীর দক্ষযজ্ঞ কে সামলাবে ভাবছি। কেদার কুণ্ডু স্বভাব রুক্ষ সুরেই বলে ওঠে, সামলাবার আবার কি আছে? যাবার সময় ডিম আর পোস্ত নিয়ে যাও। ব্যস! পোস্ত বাটা আর ভাত। ঘরে মুসুরী ডাল নিশ্চয়ই আছে।

—তা হয়তো আছে ভাই।

—তবে আবার কি? বৌদিকে বুঝিয়ে দিও পবিত্রদা, দিন বড় খারাপ আসছে। অভ্যাসটা পালটানো ভালো। এখন তবু যা হোক কিছু পাওয়া যাচ্ছে। তখন কিছুই পাওয়া নাও যেতে পারে। এমন কি দু-চার দিন হরিমটরের অভ্যাসটা করে রাখাও ভালো।

এক এক করে উঠে যেতেই দিগেন ঘরটায় তালা দিয়ে দিল। ধাদকার এই নয় নম্বর পাড়া কমিটির অফিস ঘরটা কমিটির সেক্রেটারী সুনীল মুখার্জীর কাছ থেকে আজকের মিটিংটার জন্যে নেওয়া হয়েছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলি ইদানিং আর শেড কমিটির অফিসে করা যাচ্ছে না। কারণ চাঁইরা ভীষণ নজর রাখছে। ট্যারা চোখ কালো মতো একটা বাঁদর প্রায় স্থায়িভাবেই বসিয়ে দিয়েছে সরকারের তরফ থেকে সামনের পানের দোকানটায়।

অথচ ওই পানের দোকানটায় বে আইনী মদ বিক্রি হয়। এবং সরকারের এই গোয়েন্দাটির সামনে প্রকাশ্যেই তা হয়। সেটা বন্ধ করাও নাকি বে আইনী। পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা দরখাস্ত দিয়ে বহু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুই হলো না। উপরন্তু গুণ্ডার দল খবর পেয়ে গেল কারা কারা দরখাস্ত করেছে। ফলত তারা এই বে আইনী মদের দোকানের পৃষ্ঠপোষক গুণ্ডাদের কাছে শাসানি খেল, বুঝলে বাবু খোকার দল, বেশী বাড়াবাড়ি করো না তা হলে মুরগীর মতো চিরে ফেলা হবে।

বিশেষ করে এজন্যেই ওদের এই সভাটাকে খাদকাপাড়া কমিটি অফিসে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল।

এখান থেকে বেরিয়ে দিগেন সোজা মহিশীলা যাবে। পাড়া থেকে বিতাড়িত হবার পর বর্তমানে এখানেই আছে দেবুদের বাড়ীতে। তারপর নির্দেশ এলে যেখানে যাওয়ার সেখানেই যেতে হবে। কারণ ও একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টির সদস্য।

এই রকম একটা সফল অভিযান করতে পারবে দিগেনও ভেবে উঠতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে। শহরের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সমস্ত এলাকা জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। লাল পতাকায় আচ্ছাদিত একটা ছাউনি মনে হয় সমস্ত এলাটাকে যেন ঢেকে রেখেছে।

দিগেন সফলতার অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সকলেই একবার করে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। সমর্থন জানিয়ে গেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এল. আই. সি., ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে। অভিনন্দন জানাতে এল শিক্ষক সংস্থার পক্ষ থেকে।

সে এক উৎসব।

সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন মহিলারা। এত সংখ্যায় মহিলা বেরিয়ে আসবে ভাবতেই পারা যায় না। সমস্ত কৃতিত্বটাই প্রায় বাণী সিংহের। দিগেন আনন্দে বাণী সিংহের করমর্দনই করে ফেললে, এতটা কিন্তু আমরাও আশা করতে পারিনি, বুঝেছেন মহিলা পাণ্ডা।

তা হলে তো আমাকে একটা সোনার ম্যাডেল দিতে হয়।

অবশ্যই, এতে কোন দ্বিমত নেই। তবে সেটা লকেটে করে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

তাই নাকি।

হু !

তারপর দু জনেই একসঙ্গে হেসে ফেলেছিল।

রাতের দিকে বিপিনদা, নিজে অভিনন্দন জানালেন। ফয়সল্লা তা হলে একটা করে ফেলতে পারলেন কমরেড ?

তা কিছুটা বেঁকেছে তো বটেই !

সব শুনেছি আমি। আমাদের তরফ থেকে লাল সেলাম।

দিগেন বুঝি আরও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। চুপ হয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে বিপিনদার পাশেই। বিপিনদা আলতো-ভাবে দিগেনের পিঠে হাত রেখে আবার বলেন, এটা তো হলই, এবার একটু এদিকটা দেখুন না ?

চোখ তুলে তাকায় দিগেন, এদিকটা মানে ?

মানে, বলছিলাম টি, ইউর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু যদি আঞ্চলিক কমিটির কাজ দেখাশোনা করেন তো খুব ভাল হয়। শঙ্কর একা আর পেরে উঠছে না।

দিগেন নিমেষের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এটাই তো ও চেয়েছিল। কিন্তু এক্ষুণি তা প্রকাশ না করে বিপিনদার দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে একটু ভাবতে দিন বিপিনদা।

বিপিনদা বলেন, বেশ ভাবুন। এক সপ্তাহ পরে আপনি আমাকে জানাবেন, কেমন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় দিগেন তা সে জানাবে।

বাণীর জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে। বাণী বাল্যবিধবা। বিয়ের প্রথম বছরেই শশুর ঘর থেকে ফেরত এসেছিল কপালে অপয়া ছাপ নিয়ে। তারপর থেকে আর ওমুখো হয়নি। দুঃসময় এবং শোকের দিন ক'টা কেটে যেতেই একদিন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। বছরখানেক ঘরে বসে কাটানোর পর মাকে ধরে

বসলো, আবার কলেজে ভর্তি হব মা। ডিগ্রি আরও একটা না নিলে চাকরীবাকরী পাওয়া সম্ভব নয়।

মা বললেন, হও! আমার তো কোন আপত্তি নেই। তবে একবার দাদাকে জিজ্ঞেস করে নিও। খরচ যারা যোগাবে তাদের অমত না থাকলে আমার আর কি?

—খরচ যোগানর তো কোন প্রশ্নই নেই মা। টিউশনি করে আমি আমার টাকা যোগাড় করে নেব।

দাদা শুনে বললেন আমার অমতের কি আছে, তবে একবার বৌদিকে জিজ্ঞেস করিস।

বৌদি বললেন, মেয়েদের আর পড়ে কি হবে। খামোকা খরচ! তার চেয়ে সেলাই শেখ। দরকার হলে করে খেতে পারবে।

বাণী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলো, ভর্তি সে হবেই। তাতে কারো অমত থাকলে সে অন্য ব্যবস্থা দেখবে।

এইরূপ দৃঢ় ঘোষণার পর আর কারোই বাধা দেওয়ার সাহস হয়নি। সেই কলেজে পড়ার সময়ই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল বাণী।

বাকীটা বিপিনদার কৃতিত্ব। বিপিনদাই এ পথে নামিয়েছিলেন। আজ বাণী খুশী। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পুরো দায়িত্ব নিয়ে এলাকার কাজ করে। শ্বশুরের সংসার থেকে বিতাড়িত হবার পর একদিন যে হতাশা তাকে গ্রাস করতে গিয়েছিল, এই নতুন জীবন তাকে সেই অভিশপ্ত জীবনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। বেঁচে থাকার এ এক নতুন আস্বাদ। জীবনের অর্থটাই হয়ে গেছে অন্য রকম।

প্রায় সময়ই এই নিয়ে বাড়ীতে অশান্তি। তা হোক। কিন্তু বিধবা সেজে চিরদিনের জন্যে বাড়ীর সকলকে কৃতার্থ করতে বাণী রাজী না হয়ে অন্ততঃ নিজে শান্তির, সুখের খোঁজ পেয়েছে।

বিশেষ করে দিগেনের বলিষ্ঠতা তাকে জীবন সম্বন্ধে অন্য কথা ভাবতে শিখিয়েছে।

বিপিনদাও এতে খুশী।

ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সংহতি উপলক্ষে ডুয়ার্সে হলে দুদিনব্যাপী কনভেনশনে প্রথম পরিচয় হয়েছিল দুজনের সংগে। দিগেনের সাথে আলাপ করে খুশী হয়েছিল বাণী। তারপর সে পরিচয় নানা ঘাত পেরিয়ে একদিন গভীর সখ্যতায় পরিণত হয়েছিল।

দিগেনও খুশী। বাণীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে তারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের মতো যেখানে খুশী আর যেমন খুশী ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। গালিগালাজটাও কমেছে। কথায় কথায় শালা-বাঞ্চোত আর আসে না। যদি এসেও পড়ে, বাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভেতরে কেমন যেন অস্বস্তির ভাব অনুভব করে। মাথা নিচু হয়ে যায়, অপলকে স্বীকার করে, ঠিক আছে। এরপর থেকে ঠিক হয়ে যাবে। সুধরে নিতে হবে।

বাণী হয়তো গম্ভীর হতে যাচ্ছিল কিন্তু অমন সরল স্বীকারোক্তির ফলে হেসে ফেলে, বলে, বহুদিনের অভ্যাস তো, ঠিক আছে। সুধরে নিলেই চলবে।

বাড়ীর অন্য সকলে দিগেন আর বাণীর মেলামেশাটা সহজ করে ফেলেছে। কিন্তু পারেনি শুধু দাদা-বৌদি। বিশেষ করে বৌদি ওদের মেলামেশাকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখেন।

কতদিন স্বামীকে সতর্কও করেছেন, দেখো, শেষ পর্যন্ত কোন না কেলেঙ্কারী করে বসে। তখন সংসারের মুখে কালী। আমাদেরও ছেলেমেয়ে আছে তো নাকি ?

দাদা বাসুদেব গম্ভীর হয়ে সায় দেন, তাতো আছেই। কিন্তু কি করব বল ? আরও দু-চারদিন দেখা যাক। তারপর একদিন সাবধান করে দিলেই চলবে।

কিন্তু বৌদির তর সয়নি। বাণীকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। বাণী হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, বেশতো কেলেঙ্কারী একটা আগে করি। তারপর তো তোমাদের বিপদ। কিন্তু

এখনতো ভদ্রলোককে এক কাপ চা দেবে। ঘরে বসিয়ে তত্ব আলোচনাটা কি ঠিক হচ্ছে ?

বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, চা দিচ্ছি। বলছিলাম তোমার ভালর জন্যেই। তোমাদের সংসারের ভালর জন্যেই। আমার আর কি ? তুমি নাচো আর যাই কর, সংসার তোমাদের, বুঝবে তোমরা।

—বেশ তাই না হয় বুঝব। কিন্তু এর মধ্যে আবার আমাদের তোমাদের আনা কেন ? তুমি কি আমাদের সংসারের নও, বৌদি ?

বৌদি এরপর আমতা আমতা করেছে, কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেছে, জব্দ হয়ে শেষমেষ না খেয়ে উপোস দিয়েছে।

এমনি করেই দিন কয়টা কাটছিল বাণীর। একদিকে বাইরের এই উত্তাল জীবন, কর্মসূচীঠাসা জীবন! অন্যদিকে বাড়ীর অন্তর্কোণের পিছু টান।

ডি. এস. এর বাংলো ঘেরাও সফল করতে গিয়ে প্রচণ্ড খাটুনী গিয়েছে দিগেনের। দিন সাতেকের জন্যে নাওয়া-খাওয়া সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু তারই জের এখন তাকে পোহাতে হচ্ছে। সর্বদাই কেউ তার পেছনে লেগেই আছে যেন।

ডি. এস. থেকে জেনারেল ম্যানেজার কেন্দ্রে এই নিয়ে নোট পাঠালেন। সম্ভবতঃ তারই প্রতিক্রিয়া কিছুদিন বাদেই দেখা দিল।

পবিত্র কর, ভোলা পাণ্ডে, বসন্ত দাস প্রায়ই ঘরে থাকতে পারলেন না। নিবারণ মিত্তির প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে ঘোষণা দিলেন যেখানে হোক যেভাবেই হোক দিগেন বসুকে তার চাই। নয়তো তার চাকরী করাই দায়।

বাণী আঞ্চলিক অফিসে এসে দেখে দিগেন মনোযোগ দিয়ে কতকগুলি চিঠি টাইপ করছে। তারপরই আছে ওদের একটা সভা।

যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যেও দিগেনকে আজ যেন খানিকটে বেশী খুশী খুশী মনে হচ্ছে।

হাতে নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী নেই। থাকলে, ওর চেহারা তখন অন্য রকম। খোঁচা খাঁচা দাড়িতে সর্বদাই চিন্তা ক্লিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটা শেষ করে ফেলতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এক বিশ্রী উদ্বেগ!

বিপিনদার কথাটা দিগেনকে সত্যিই উৎসাহিত করে তুলেছিল। তারপর থেকেই কিছু কিছু কাজ দেখতে শুরু করে দেয়।

শঙ্কর চৌধুরী এর জন্যে সবচেয়ে বেশী খুশী। এক রাশ কাজের বোঝার মধ্যে দিগেন তাকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারবে।

বাণী সিংহ অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল। মিটিং হয়ে গেছে কখন। কি যে অত গোপন কথা লোকটার! বেরুবে কি বেরুবে না? অফিসের বাইরের চাতালটায় পায়চারি করতে থাকে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ ক্রমশই লাল হয়ে আসছে। ক্রমশই লাল।

এইমাত্র পশ্চিম দিগন্তের লাল আভা মিলিয়ে গেল। পিচঢালা মোষরঙা রাস্তাটায় নেমে এসেছে প্রশান্ত সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা। মাঝে মধ্যে দু-একদিন বর্ষা নামলেও শহরে এখনও প্রচণ্ড গরম।

বহুদিন বাদ একসঙ্গে দুজনেই ফুরফুরে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিল। অনেকদিন বাদই দুজন, বাণী আর দিগেন, একটু আয়েসের ঢঙে হাঁটছিল। আঞ্চলিক অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে না চেপে বাণীই প্রথম জিজ্ঞেস করে দিগেনকে, এরপর কি প্রোগ্রাম তোমার?

দিগেন স্মৃতির থলেতে হাতড়ায় কিছুক্ষণ, তারপর বলে, উহুঁ আজ কোন প্রোগ্রামই নেই, একদম ফাঁকা।

—আমারও নেই।

—তা'লে? তা'লে চলো হেঁটেই যাওয়া যাক। তোমাকে চিত্রার মোড়ে ছেড়ে দেব।

বাণী সম্মতি জানিয়ে বলে, তাই চলো।

তারপরই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল অফিস, কল-কারখানা ছুটি হওয়া মানুষগুলির সঙ্গে। কোর্ট মোড়ে আসতেই কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। দেয়াল-ঘেরা জেলখানার পাশেই থমথমে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের বাড়ীগুলি। অনেকটা গ্রামের বন্ধ হাটবারের মতো। একে আরেকের গায়ে খুশীতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বাণী বললো, কি ভীষণ ফাঁকা হয়ে গেল নয়?

—হুঁ। তবে পায়ে পায়ে পোলো গ্রাউণ্ড পেরুলেই আবার জনস্রোত পাবে। আমি কিন্তু ওই মাঠের পর আর যাবনা।

তা জানি। একটা বিশ্রী অবস্থা নয়? এভাবে পালিয়ে পালিয়ে ক'দিন কাজ করতে পারবে কে জানে।

তাছাড়া প্রকাশ্যে বেরুবার উপায় কই বলো। সামনে পেলেই তুলবে। টুনু ঘোষের দল তো খাপ্পা হয়ে আছে। এলাকার মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে দেখা পেলেই লাস ফেলে দেবে।

এর পাল্টা তোমরা কিছু ভাবছ? না শুধু ওরা কি করবে তাই নিয়েই বসে আছ?

দিগেন অন্ধকারেই মিটি মিটি হাসে, তুমি কি ভাবছ, বলতো? আমরা চুপ করে বসে আছি না কিছু করবার চেষ্টা করছি?

দিগেনের পালটা প্রশ্নে বাণী প্রথমে একটু হকচকিয়ে যায়। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, না, বসে তোমরা ঠিক নেই। বসে তোমরা থাকতেও পারনা। তবুও জিজ্ঞেস করলাম। এসব শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়তো। আমাদের মানুষগুলো শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে আর আমরা কিছু করতে পারছিনা, সত্যিই খারাপ লাগে। লাগেনা, তুমিই বলোনা।

দিগেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, তাতো নিশ্চয়। তবে কি জানো, আমরাও বসে নেই। পরক্ষণে একটু থেমে আশার বাণী শোনায়, অনেক জায়গায়ই এরই মধ্যে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

আমাদের নামোপাড়া অঞ্চলটা সাংগঠনিক দিক থেকে একটু দুর্বল। তবে আমরাও সামলে নিচ্ছি। সবচেয়ে অসুবিধে কি জানো, প্রকাশ্যে তো কিছু করা যাচ্ছে না। যতোটা পারছি গোপনে গোপনে। তার ওপর ওই সব ইডিয়েটগুলো যদি নিজেরা একা হতো তাহলে এত বেকায়দায় পড়তে হতো না। ওদের আসল সহায় তো পুলিশ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাদা পোশাকে পুলিশ ওদের সাহায্য করে। ফলে অনেক সময় আমরা এঁটে উঠতে পারি না। তবে তাদের মুখোমুখিও আমাদের হতে হবে। বেশ বলিষ্ঠ ভাবেই ঘোষণা করে দিগেন শেষের কথাগুলি। বাণী অবশ্য এসব যে জানে না তা নয়, জানে ঠিকই। তবু অতি উদ্বেগ থেকেই বুঝি তার বারবার এই জিজ্ঞাসা। সে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

দিগেনের জবাবে সে খুশীই হয়। তার কাছে আরও সরে এসে ভরসার সঙ্গে জিগ্যেস করে, পারবে পুলিশকে সামলাতে ?

পারবনা মানে ? আমাদের কমরেডরা যদি সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে পারে, উত্তর ভিয়েৎনামে যদি আমেরিকার মতো এতবড় একটা শক্তিকে কোণঠাসা করে দিতে পারে আর আমরা সামান্য পুলিশকে সামলাতে পারব না ? বড় বেশী বলিষ্ঠতার সঙ্গেই যেন বলে ওঠে দিগেন।

বাণীর হৃদয়েও বুঝি আবেগ সঞ্চার হয়। অনেকটা আবেগ সঞ্চিত সুরেই বলে, হ্যাঁ, শেষ লড়াইতো একদিন আমাদেরও করতে হবে। ঠিকই বলেছ তুমি। এখন থেকে প্রস্তুতি আমাদের নিতেই হবে। আর তা না হলেই হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। একদিন ওরা ইন্দোনেশিয়া বানাবে আর আমরা হায় হায় করে কপাল চাপড়াব। বিলাপ করতে থাকব। যাক, ওসব তো হল গিয়ে অনেক পরের কথা। একটু ইতস্তত ভাবেই যেন জিজ্ঞেস করে বাণী, এখন তোমার কাজে জয়েন করার কি হলো বলত ?

দিগেন মুখ নিচু করে পাশাপাশি হাঁটছিল। বাণীর প্রশ্ন শুনে

একটু ভাবনা জড়িত স্বরে বলে, জয়েন করার কথা বলছ? ভাবছি এভাবে যতদিন চলে চলুক। ফয়সলা হয়তো হোক। আর না হয়তো সেও ভি আচ্ছা। কাজে আর জয়েন করব না।

বাণী চোখ তুলে চমকে তাকায়, তার মানে?

মানে-টা অতি সোজা। এতে চমকাবার কি আছে? ভাবছি পার্টির হোলটাইমার হিসেবে কাজ করব। বিপিন দা সেদিন সরাসরি আমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছেন।

কিন্তু?

না বাণী, এতে কিন্তু-টিন্তু করে লাভ নেই। আমি সোজাসুজি ভেবেছি, যদি কাজ করতে হয়তো পার্টির হোলটাইমার হয়েই করতে হবে। দুদিক রক্ষা করে চলবে না। ওটা অনেকটা সুবিধাবাদী ঝোঁক। চাকরীও করব, সংসারও চালাব আবার পার্টির কাজকম্ম দেখব, তা হয় না। তাতে গোঁজামিল চলতে পারে, কিন্তু সঠিক কাজ করা কঠিন।

বাণী তবু ইতস্তত: করে, তোমাদের অতবড় সংসার! কি করে চলবে?

কেন, তোমরা তো আছ। দশজন আছে। যাদের হয়ে কাজ করবো তারা থাকবেন। সবাই মিলে দেখবে। দিগেন অন্ধকারের মধ্যেও বাণীর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে।

বাণী কি উত্তর দেবে ভেবে পায়না। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা সবাই যদি হোলটাইমার হয়ে যায় তবে সকলের খরচটাই বা আসবে কোত্থেকে?

তাই আবার হয় না কি? সকলকেই হোলটাইমার হতে হবে কেন? যাদের প্রয়োজন তারাই হবে। বাকীদের টাকা-পয়সা রোজগার করতে হবে বৈকি। তুমি কমরেড চে-গুয়েভারার ডাইরী পড়েছ? কত সুন্দর ভাবেই না তিনি বলেছেন বলতো, আমার জীবন বিপ্লবের জন্য। আমার স্ত্রী-পুত্র তাই রাষ্ট্রের সম্পত্তি।

আমি বিপ্লব দেখব, রাষ্ট্র আমার সংসার দেখবে, নাবালক সন্তানদের ভার নেবে।

বাণী এই প্রসঙ্গটা তুলে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আসলে ওর কাজে জয়েন করতে জানতে চাওয়ার পেছনে বোধ হয় খানিকটে ব্যক্তিগত প্রশ্নও জড়িত ছিল। অন্ততঃ মনের মণিকোঠায় দুর্বলক্ষণেও একটি অন্য চিন্তার ঝিলিক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, লোভের ইশারা যতোই হোক—হাতছানিটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল বাণী। এইক্ষণে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললে। সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি টেনে আচমকা বলে ওঠে, এবার তুমি যাও। তোমাকে আবার অনেকটা পথ একা যেতে হবে।

সম্ভবতঃ দিগেনেরও আরো বলার ছিল, জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু বাণীর এরকম আচমকা দাঁড়ি টেনে দেওয়ায় প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। সামলে নিয়ে বললে, ঠিক আছে, তুমি তাহলে চিত্রার মোড় থেকে বাস ধরে নিও। আমি সুকান্ত পল্লীতে সুদীপ্তদের মেস হয়ে যাব। ওর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটাবার কর্মসূচী নিয়ে দুজনেই রওনা হলেও বাস্তবে তা আর হয়ে উঠল না। দুজনেই দুজনের কাছ থেকে লুকাতে চাইল। দিগেন দ্রুত পা চালালো সুকান্ত পল্লীর দিকে।

বাণী বাসে উঠে পড়লো নতুন টাউনে ওর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যেখানে এখুনি গেলেই নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। বৌদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা একটা করে জিজ্ঞেস করবেন। বাণী হুঁ, না করে জবাব দেবে। মা আর দাদা চুপ করে শুনে যাবেন।

ইচ্ছে করেই অন্যদিন যা করে না তাই করে বসল বাণী আজ। বাড়ীর সামনে না নেমে ষ্টেশন রোডের মোড়ে নামল। হাতের থলেটা নেড়ে চড়ে দেখল একটা দশ টাকার নোটের সঙ্গে আরও গোটা দুই

খুচরো টাকা রয়েছে। তা থেকে ছোট্ট ভাইপোটার জন্মে একটা চকলেটের বাক্স কিনল, মায়ের জন্মে পাঁচশো গ্রাম আপেল, আর বৌদি বহুদিন ধরেই জরদা জরদা করছিল। কৌটা একটা নিল সুন্দরী জরদার। পা ফেলে ফেলে বাড়ীতে ঢুকলো যখন, রাত বেশ গড়িয়ে গেছে।

বৌদির হাতে সবগুলি তুলে দিয়ে বলল, এই নাও, রাস্তায় পেলাম নিয়ে এলাম।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এসব আবার কেন গো? আজ সূর্য্যিটা কোনদিকে উঠেছিল কে জানে?

মা গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে বৌমা?

বাসুদেব দেখেছিল বৌর কাছে নামাতে। একটু খুশী হয়েই ছিল বোধ হয় আজ। যদি এভাবে সংসারের দিকে টান বাড়েতো মন্দ কি? মাকে লক্ষ্য করে বলে, কিছু না মা। তোমার বৌমার সব কিছুতেই হৈ চৈ করা চাই। বাণু বোধ হয় আসবার পথে দু-একটা জিনিষ এনেছে তাই তোমার বৌ টিপ্পনী কাটছে।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ও!

সম্ভবতঃ বাণী এটাই চেয়েছিল। হাজারো প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতেই চাইছিল। কারণ ও আজ একটু একা থাকতে চায়।

বাণী আর দাওয়ায় দাঁড়ালো না। কোন রকমে গায়ের কাপড় ছেড়ে একটা আটপৌরে পোশাকে ছাদের উপর উঠে গেল। আকাশে সপ্তমীর ভীরু চাঁদ মেঘের আড়ালে কখনও উঁকি দিচ্ছিল কখনও লুকিয়ে অন্ধকার করে দিচ্ছিল। প্রায় অর্থহীন ভাবেই সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ছাদের উপর পায়চারি করল। কখনও একজায়গায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে কোন সুদূর সেই টিম টিম করা রাস্তার আলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু কেন এরকম করছে বাণী আজ? কি যেন একটা ছটফট ভাব। কি যেন না বলা, অব্যক্ত একটা চাপ ভেতর থেকে ওকে

কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু কেন অমনটা হচ্ছে! তবে কি বাণী মনে মনে মেনে নিতে পারছে না দিগেন পার্টির হোলটাইমার হোক? কিন্তু মেনে নিতে না পারার কারণটাই বা কি? তবে কি তার মনে দিগেন সম্বন্ধে কোনরকম দুর্বলতা পোষণ করে এসেছে এতদিন? তবে কি সে দিগেনকে····? হ্যাঁ, হয়তো এই সত্যি। দিগেনকে সে চেয়েছিল একান্ত করে নিজের করে পেতে। মনে মনে কি এ ভাবনা ছিল যে দিগেনেরও তাতে পূর্ণাঙ্গ সায় থাকবে। হয়তো তাই চেয়েছিল বাণী।

কিন্তু এই হয়তো ভাল হল। আজও যদি দিগেন না বলতো সে পার্টির হোলটাইমার হতে চায়, বাণী বুঝতেই পারতো না, দিগেন পার্টিকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভালবাসে।

নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে টানাপোড়েনের পর এক সময় ক্লান্ত হয়ে নিচে নেমে এল ধীর পায়ে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে বাণী তক্তার উপর হাঁটুতে মাথা গুঁজে সে রাতটা কাটিয়ে দিলে।

দিগেন যখন সুদীপ্তর মেসে এসে পৌঁছেছে, সুদীপ্ত তখনও ফেরেনি। কিন্তু তার খবরটা নিয়েই বিপিনদাকে দিয়ে আসার কথা। কাঠগোলা মজদুর ইউনিয়ন নিয়ে কিংশুকের দল কি একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে। সুদীপ্ত এবং কিংশুক যৌথ ভাবেই কাঠগোলা ইউনিয়ন দেখতো। প্রচুর সম্ভাবনা থাকতেও বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরেই গত সম্মিলনে সাধারণ মজদুরদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েও কিংশুককে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ইদানিং নাকি ও ভীষণ চালাকি সুরু করেছে। বহুদিন ধরে বলা সত্বেও টাকার হিসেব দিতে রাজী নয়।

আজকে জোর করে বসানো হয়েছে তাকে। দিগেনের কথা

ছিল সুদীপ্তের মেসে গিয়ে খবরটা নিয়ে, কি হলো না হলো বিপিনদাকে জানিয়ে আসবে। অথচ সুদীপ্ত এখনও ফেরেনি।

তাহলে কি সভা এখনও শেষ হয়নি ? কিংবা কোন বিপদ-টিপদ। সভা তো এতক্ষণ চলার কথা নয়। সেই দুপুরে সুরু হয়েছে, সন্ধ্যের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা! কাছেপিঠে একটা ফোন পেলেও হতো। ফোনে একবার খোঁজ নিতে পারতো, অন্ততঃ বিপিনদাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে সুদীপ্ত এখনও ফেরেনি। মেসের অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে পুলক সুদীপ্তের ঘরেই থাকে। দিগেনকে দেখে সেই প্রথম বেরিয়ে এসেছিল। দুজনেই বসে বসে আরও কিছুক্ষণ দেখল। তারপর পুলক নিজেই ইচ্ছে প্রকাশ করল, আমি এক কাজ করি, আমি না হয় ওদের ইউনিয়ন অফিসে চলে যাই। মোটর গ্যারেজ ইউনিয়ন আর কাঠগোলা ইউনিয়ন অফিস তো এক অফিস ঘরেই চলে ?

দিগেন মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি একা যাবে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সাইকেল রয়েছে দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে চলে আসব। বলেন তো আঞ্চলিক অফিসে খবরটাও দিয়ে আসা যাবে।

দিগেন কি জবাব দেবে ইতস্ততঃ করছিল। সুখেন্দু, নিমাই আর বিনোদ তা করতে বেরিয়ে এল। ওরাও রকে বসে পড়ল। সব শুনে নিমাই এগিয়ে আসে, আপনি এখানেই একটু বসুন। আমরা দুজনেই সাইকেলে চলে যাচ্ছি। সত্যি, ব্যাপারটা ঘোরালই মনে হচ্ছে।

—বেশ, তাহলে তাই কর। আমি একটু বসেই যাই।

এরপর পুলক আর নিমাই দুজনই সাইকেলে চেপে বসে।

শুধু কাঠগোলা নয়। যেখানে যেখানে যৌথ ইউনিয়ন ছিল সব জায়গাতেই কিংশুকরা এখন ঝঞ্চট সুরু করেছে। মিউনিসি-প্যাল ইউনিয়ন, বিশ্বাস ফার্নিচার, হকার্স এবং ট্যাক্সি ইউনিয়নেও

গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অথচ মুখে ঐক্য ঐক্য বলে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে যতো রকমের ব্যাগড়া।

একাত্তরের পরই এই ঝোঁকটা প্রবল আকারে দেখা দেয়। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সংগ্রামী সর্ব বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এই সময়েই আনুষ্ঠানিক ভাবে রূপ নিল, স্বভাবতই অন্যান্য সংগঠনগুলি বুঝতে পারল সামনে বিপদ। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বভাব-দক্ষতা থাকে। কোনটা আসল আর কোনটি মেকী ধরতে তাদের সময় লাগেনা। তারা সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখে কে তাদের সংগ্রামে সাথী আর কে সংগ্রামের বিরোধিতা করে শাসককুলের সহযোগিতায় সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করে। স্বভাবতই তারা এসে জমায়েত হয় সংগ্রামী সংগঠনের পতাকাতলে। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে মজদুর ভাইদের সংগ্রামী প্রিয় সংস্থা সিটু। আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি এই সিটু! ভবিষ্যতের স্বপ্ন!

দিগেন প্রায় আধঘণ্টা ধরে বসে পত্রিকাগুলো ওলটপালট করলো। ফাইলে কিছু কাগজপত্র ছিল তাও ঘাঁটল তবু পুলক আর নিমাইর দেখা নেই। অথচ দশ মিনিটের মধ্যে তাদের আসার কথা।

ভেতরে ভেতরে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল দিগেন। ঘটনা তাহলে যাহোক একটা ঘটে গেছে।

এবং আশঙ্কা যা করেছিল বস্তুতঃ তাই সত্যি হল। প্রায় এক ঘণ্টা পর নিমাই আর পুলক হন্তদন্ত হয়ে সাইকেল নিয়ে ফিরে আসে। উভয়েই ভীষণ উত্তেজিত। নিমাই সাইকেলে পা রেখেই বলে, ভীষণ ব্যাপার দিগাদা, এখুনি আঞ্চলিক অফিসে খবর দিতে হবে। সুদীপ্তকে আটকে রেখেছে।

—তার মানে?

দুপুরের দিকে স্বাভাবিক ভাবেই সভা সুরু হয়েছিল। আমাদের লোকজনরাও তৈরী হয়েই এসেছিল। আলাপ-আলোচনা চলতে

চলতে চলতে হঠাৎ কিংশুক আলোচনা বন্ধ করে দেয় এবং পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ও আর আলোচনা চালাতে রাজী নয়। কনফারেন্স ডাকা হোক, হিসেবপত্র সেখানেই দেবে।

সুদীপ্ত বিরোধিতা করে।

দিগেন জানবার জন্য উদগ্রিব হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি বললে সুদীপ্ত ?

সুদীপ্তই তো শুধু নয়। আমাদের লোকেরা সবাই মিলে চাপ দিতে থাকে হিসেব তাকে দিতেই হবে। এখুনি প্রস্তুত না থাকলে দুদিন কিংবা তিন দিন সময় নিক সে।

তারপর ?

ও ভীষণ এডামেণ্ট হয়ে ওঠে। যা বলেছে তাই। এক পাও নড়বেনা।

পুলক সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, ওরা আগে থেকে তৈরী হয়েই এসেছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই গ্লাসের কিছু শ্রমিক আর চল্লিশ পঞ্চাশ জনের ওপর গুণ্ডা নিয়ে নিরঞ্জন হঠাৎ হামলা চালাবার জন্য তৈরী হতে থাকে। অফিস ঘরটাকে ঘিরে ফেলে হাল্লা চিৎকার, মারো কাটো এই সব আরম্ভ করে। ভেতরে আমাদের গ্রুপ বেশী। সুদীপ্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। কিংশুককে সতর্ক করে দেয় ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে কিংশুক। মিটমাট করতে এসেছো ভালো। কিন্তু বাইরে ওসব কি ?

কিংশুক আকাশ থেকে পড়ার ভান করে।

সুদীপ্ত দৃপ্তভাবে ঘোষণা করে, ওসব চালাকি ছাড়ো, হামলা যদি করে তুমি এবং তোমার দল ভেতরে যারা আছ কেউ রেহাই পাবেনা। আমরা তৈরী।

কিংশুক ঘাবড়ে যায়। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, সুদীপ্ত-তুমি বিশ্বাস করো, আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিনা। একটু বাইরে থেকে দেখে আসি।

সুদীপ্ত বাধা দেয়, না তা হবে না। দেখতে হলে অন্য কেউ যাক। আমি যদি এখানে আটকা থাকি তো তুমিও থাকবে। সেই ফাঁকেই ভেতর থেকে আমাদের ইউসুফ বেরিয়ে এসেছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই সব জানিয়ে দিয়েছে। এখনও বাইরে এবং ভেতরে শ্লোগান চলছে। বেশ উত্তেজনা রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে যা হোক কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

দিগেন শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, পুলিশ এসেছে ?

নিমাই উত্তর দেয়, পুলিশ যেন দেখলাম না। এলেও কাছাকাছি কোথাও নেই।

দিগেন আর দেরী করলো না। পুলককে বললো, তোমার সাইকেলটা দাও। তোমার তো কাল দশটায় ডিউটি ?

—হ্যাঁ।

—তার আগেই পেয়ে যাবে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই দিগেন সাইকেলে চেপে বসে। আঞ্চলিক অফিসে যখন এসে পৌঁছুল তখন রাত পৌনে দশটা।

বিপিনদা, শঙ্করদা অফিসেই ছিলেন। দিগেনের কাছে সব শুনে বিপিনদা যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। শুধু শঙ্করদা বিগড়ে গেলেন, এতক্ষণ কি করছিল ওরা, একটা খবর পাঠাতে পারেনি ? রাত দশটার সময় সব লোকজন তৈরী হয়ে বসে আছে নয় ? একটু বুদ্ধি করে কাজ করবেনা।

বিপিনদা অনেকক্ষণ ধরে শঙ্করদার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর খুব নিচুস্বরে বলেন, দোষটা তো ওদের বটেই কমরেড, ওরা এতক্ষণ খবর দেননি। কিন্তু অফিস থেকে তোমাদেরও তো উচিত ছিল খোঁজ নেওয়া। তোমরা একটা কাজে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলে। ভাগ্যিস দিগেনকে আমি পাঠিয়েছিলাম।

শঙ্কর এবার মুখ নামিয়ে নেয়। দিগেন দুজনের দিকে দুবার

তাকিয়ে নিয়ে বলে, দোষ গুণ তো পরে হবে, কিন্তু এখন তো কিছু লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতেই হয়।

বিপিনদা কোন কথা না বলে ফোনের ডায়ালটা ঘোরাতে থাকেন। অপর প্রান্ত বিজলী অফিসের ফোন থেকে সাড়া আসে, ইয়েস বলুন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই বলছি।

—আমি বিপিনদা।

—বলুন। আমি নারাণ।

—তোমাদের দশটার সিফ্‌ট এখুনি ছুটি হবে?

—হ্যাঁ।

—কত লোক হবে?

—প্রায় শ' দুই।

—এক্ষুণি ওদের একবার কাঠগোলা মজদুর ইউনিয়ন অফিসে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যারেজ ইউনিয়ন অফিস! হ্যাঁ এক্ষুণি, এক্ষুণি।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জিজ্ঞাসা ভেসে আসে চিঁচিঁ করে, কি ব্যাপার?

আমাদের সুদীপ্তকে ওরা আটকে রেখেছে। হ্যাঁ আজ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল হিসেব-টিসেব নিয়ে বসবে বলে! হ্যাঁ, ওই নিরঞ্জন দাশ নাকি নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যাইহোক ব্যবস্থা করছ তো! করছ! ধন্যবাদ। আমি কিন্তু ফোন ধরে রইলাম।

এরপর ধপ করে ফোনটা রেখে দিলেন বিপিনদা। বিপিনদাকে ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে কিছুটি বোঝার জো নেই! শুধু শঙ্কর এবং দিগেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে যাবে? শঙ্কর না তুমি? ও তুমি তো আবার ওয়াণ্টেড পারসন! শঙ্করই তা হলে, একবার রওনা হয়ে যাও।

দিগেন দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে, না শঙ্করদা নয়, আমি যাব। থাক ওয়ারেণ্ট। ওই অতগুলো লোকের মধ্য থেকে যদি আমাকে

গ্রেপ্তার করে তো করুক। দেখাই যাক না কমরেডরা আমাকে বাঁচাতে পারেন কিনা।

অন্যদিন রেণু এতক্ষণ জেগে থাকেনা। কিন্তু আজ টুনুর সঙ্গে ও একটু বোঝাপড়া করতে চায়। দিন দিনই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ ছেলেটা এমন ছিলনা। বাবা কোন দিন তাদের কারো দিকে তাকাবার সময় পাননি। কোর্ট-কাছারী, বন্ধু-বান্ধব, সভা-সমিতি এসব নিয়ে একটা ব্যস্ততার মধ্যে-সর্বদাই প্রায় বাইরে কাটান। মা মারা গেছেন সেই কোন দশ বছর আগে। মাসি এসে কিছুদিন ছিলেন। বাবার সঙ্গে খুব একটা বনিবনাও ছিলনা। লক্ষ্য করেছে প্রায় রাতেই মাসি ফুঁসে ফুঁসে বাবার সঙ্গে চাপা গলায় ঝগড়া করছেন। বাবা কোন জবাবই দিচ্ছেন না। তারপর কি হলো কে জানে, একদিন সকালবেলা মাসি বাড়ী থেকে উধাও। যাবার সময় সঙ্গে মায়ের যতো গয়না ছিল সব নিয়ে গেছেন।

বাবা উচ্চবাচ্য করেন নি। পরন্তু মাসি চলে যাওয়ার পর বাবাকে কেমন যেন খুশী খুশী মনে হতো।

টুনু তখন বছর বারো বয়সের। রেণুর চেয়ে দুবছরের ছোট টুনু। কিন্তু আচারে আচরণে রেণু কখন যেন মায়ের আসনে বসে গেছে। টুনু দিদি ছাড়া আর অন্য কাউকে পরোয়া করে নাসেই থেকেই।

রেণু কমলা মাসিকে বললো, তুমি খাবর ঢাকা দিয়ে শোওগে যাও। আজ আমি বসছি। টুনু এলে আমিই ব্যবস্থা করে নেব।

কমলার হাই উঠছিল। রেণু বলতেই যেন বেঁচে গেল! তবু বাইরে একটু কর্তব্য বোধের ভান করে বলে, তুমি আর জেগে থাকবে কেন মা। তুমি খেয়ে নিয়ে শোওগে। রোজ আমিই থাকি। আজও না হয়—

কমলার কথা শেষ হওয়ার আগেই রেণু রোলগোল্ডের ফ্যান্সি চশমার ফাঁকে কমলার দিকে তাকায়। কমলা মাসি আর কথা শেষ করতে পারেনা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেণু গল্পের বই-এর মধ্যে আবার চোখ নামিয়ে নেয়, কমলাকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি ইদানীং একটু বেশী কথা বলছ মাসি। আমি যখন বলছি যেতে তখন তুমি যাবে। তার আবার কথা কি ?

কমলা তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শত হলেও মালিক তো।

রেণু আবার বলে, তুমি যাও। দরকার হলে ডেকে নেব।

এরপর কমলা দাঁড়ায় না। প্রায় বছর পনের কমলা এদের বাড়ীতে রান্না করে। মায়ের আমল থেকে। পুরনোদের মধ্যে দুজনেই এ বাড়ীতে এখনও টিকে আছে, জীবন আর কমলা। জীবন বহুবার কাজ ছেড়ে চলে যাবে বলে তৈরী হয়েও শুধু বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে আর যেতে পারেনি। কমলার ব্যাপারটাও প্রায় তাই।

বাবা আজ বাড়ী ফিরবেন না বলে গেছেন। সাইকেল কারখানার নতুন ডাইরেক্টর জেনারেল ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ রাতে আর ফিরবেন না। ওনার জন্যে যেন অপেক্ষা না করে কেউ, সেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

রেণু অভ্যাস মতো বিকেলে গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিল কিন্তু ফিরেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাথ রোড পেরিয়ে গাড়ী জি. টি. রোডে পড়তেই দেওয়ালের দিকে চোখ আটকে যায়। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় জ্বলজ্বল করছে সিনেমা পোষ্টারের পাশেই—

সমাজবিরোধী টুলু ঘোষকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

নাকমুখ লাল হয়ে উঠলো রেণুর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে উত্তেজনা থামাবার চেষ্টা করল।

বাজারের দিকে মোড় ঘুরতেই আরও একটা পোস্টার, গুণ্ডার সর্দার টুনু ঘোষ মনে রেখো দালালদের জন্যে কবর খোঁড়া হচ্ছে !

এরপর আর বাইরে তাকালো না। সোজা আটোয়ালে পৌঁছে গেল। ওখানে বাবার দুটো গাউন করতে দেওয়া আছে। তা ছাড়া নিজেরও কিছু পমেটম ইত্যাদি কিনতে হবে।

কিন্তু রেণু যা ভাবতে পারেনি তার চেয়েও বড় বেশী বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল ! সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় দরজির ঘরে যাবার প্রশস্ত করিডোরের বাঁ পাশেই 'আটোয়াল বার'।

রেণু পেরুতে যেতেই একটা চেনা অথচ দমফাটা হাসি তাকে চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করে।

একি দেখছে রেণু! রেণুর মাথার চুল থেকে সিরসির করে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন পায়ের নখের ডগ পর্যন্ত নেমে গেল তড়িৎ-প্রবাহের মতো। এখুনি হয়তো জমে যাবে রেণু। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না। কিন্তু চোখ কচলে ভালো করে আবারও দেখতে গিয়ে দেখল, এ যে টুনু, এতে কোন ভুলই নেই !

আর এগুতে পারলনা রেণু। থাক বাবার পোশাক। রেণুকে এক্ষুণি ফিরতে হবে।

কিন্তু টের পেলনা টুনু। টুনু ততক্ষণে তিন চারটে ভাড়া করা এ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মেরে যাচ্ছে আর বিলেতি মদের পেগে চুমুক দিচ্ছে।

রেণুর মনে হলো কে যেন ওর কানের ভেতর এক তাল সীসা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে।

দ্রুত নেমে এল রেণু। বাড়ী পৌঁছেই গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর দারুণ ছটফট। শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলো না। ভয়ানক জ্বালা। অন্তর্দাহ। কখনও দাঁড়ালো কখনো পায়চারি

করলো। কখনও চিৎকার করে একে ডাকলো। ওকে দুর দুর করে তাড়ালো। এটা ভাঙলো, ওটা ছুড়লো, এমন কি কমলা মাসি আর জীবন কাকাকে যাতা বললো। দেখে শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল, একি কাণ্ড কারখানা বাবা!

এক সময় একেবারে ঝিমিয়ে পড়লো। গুম হয়ে বসে রইলো। যা হোক হেস্তনেস্ত একটা করবেই করবে।

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। কিন্তু দেখা নেই টুনুর। আরও রাত বাড়লো। বসে বসে রেণুর চোখটা বোধ হয় লেগে এসেছিল। সিঁড়ির গোড়ায় জুতার শব্দ পেতেই হকচকিয়ে উঠে বসল চেয়ারের মধ্যে। হাত থেকে নামিয়ে রাখল বইটা।

টুনু মেঝের মধ্যে বসেই টেনে টেনে জুতো-মোজা খুলে ফেলে। তারপর ছুড়ে ফেলে দেয় দেয়ালের দিকে। মাঝের ঘরটায় ওরা সাধারণতঃ বসে। অন্দরমহলের বৈঠকখানার মতো ব্যবহার করে। এই ঘরটার ডান দিকের ঘরে টুনু, বাঁ দিকের ঘরে থাকে রেণু। বাবা নিচেই থাকেন।

টুনু ঘরে পা ফেলতেই চোখ পড়ে যায় দিদির দিকে। একবার চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, তুই এখনও বসে যে!

রেণু জবাব দেয় না প্রথমে। তেমনি চুপ করে বসে থাকে।

টুনু রেণুকে লক্ষ্য করে বলে, আমি খাবনা। বন্ধুর বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

রেণু উঠে দাঁড়ায়, গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়, বন্ধুর বাড়ী থেকে নয়, আটোয়াল হোটেল থেকে!

তার মানে? চমকাবার ভান করে টুনু।

রেণু বিরক্তি প্রকাশ করে, চমকে উঠে লাভ নেই। আমি নিজে দেখে এসেছি। কতকগুলি এ্যাংলো ছুঁড়ির সঙ্গে আটোয়ালে বসে কি করছিলে।

টুনু বুঝতে পারে আজ সে ধরা পড়ে গেছে। সুতরাং, লুকিয়ে

কোন লাভ নেই। উপরন্তু যদি এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারে তো দিদি বিপদ বাধিয়ে বসবে। যেমনি ভাবা তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বেশ তাহলে তো সবই জানিস। তাহলে বসে থেকে আর কি করবি? শো গে যা। শুধুশুধি শরীর খারাপ করা।

—আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আমি জানতে চাই।

—কি জানতে চাস?

—আর ক'দিন এসব চলবে?

—ও। এই ব্যাপার। তা এ ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে, এমন কিছু কড়ার করেছি নাকি?

রেণু বুঝতে পারে টুনু কোন সম্মানই তার রাখবে না আজ। কিন্তু নিজেকেও আর সামলাতে পারলোনা। হঠাৎ অভদ্রভাবেই চিৎকার করে ওঠে, এ বাড়ীতে থেকে এসব চলবে না। কিছুতেই এ আমি চলতে দেবনা।

দিদির অবস্থা দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে টুনু। তারপর টেনে টেনে বলে, দেখ দিদি তুই বোধ হয় একটু বেশী গার্জেনি ফলাচ্ছিস, আমি যা করছি, সেটা আমার দায়িত্বেই করছি। আর যা করছি তার জন্যে কারো কাছে কৈফিয়তও দেবনা।

রেণু বুঝি আরও রেগে যায়, পরিস্থিতি, পরিবেশ, সময় ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করতে থাকে, হ্যাঁ তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে। তুমি মদ খেয়ে মাতলামি করবে, বাইরে ফষ্টিনষ্টি করবে, ফ্যামিলির নামে ছাই মাখাবে আর আমি চুপ করে বসে থাকবো? না, তা কিছুতেই হবে না। যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করতে আমি চাই। তাতে যদি এ বাড়ী আমাকে ছাড়তে হয় সেও ভি আচ্ছা। কিন্তু কৈফিয়ত তোমাকে দিতেই হবে!

—বা বাব্বা। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেছে তো। কাজকম্মো সেরে কোথায় বাড়ী ফিরলাম যা হোক একটু রেস্ট নেব, তা আচ্ছা ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে। নিজের মনেই বিড় বিড় করতে থাকে টুনু! ঘাড় বাঁকিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, তোর দিদিগিরি ফলানো শেষ হলো তো? এবার যেতে দে।

আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না!

—জবাব! ব্যঙ্গের সঙ্গে হেসে ওঠে টুনু ঘোষ, তাহলে টুনু ঘোষের কাছেও জবাব চাইবার লোক আছে। কিন্তু আমি তো জানতাম আমার কাছে শুধু জবাব দিতে হয়। আগে জানলে না হয় তৈরী হয়ে নিতাম। জবাব টবাব কিছু দিতে পারব না। আর তবু যদি জবাব তোকে দিতেই হয় তাহলে সে জবাবটা বাবার কাছ থেকেই নিস! এবার আমাকে যেতে দে, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

—বাবার কাছে মানে? কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে রেণু!

—হ্যাঁ, জবাব দিতে হলে বাবাই দেবে, আমি না।

রেণু আরও আতঙ্ক অনুভব করে, টুনুর কাছে সরে এসে বলে, তুই কি বলছিস, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিছু বোঝার দরকার নেই দিদি। যত না বুঝতে পারিস ততই ভালো। টুনু বলতে বলতে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। পরক্ষণে পকেট থেকে টেনে একটা অটোমেটিক রিভলবার বার করে। টেবিলের উপর ছুড়ে দিয়ে বলে, এই অটোমেটিক ইউ. এস. এ পিস্তলটা দেখছিস, এটার দাম কত জানিস?

প্রত্যুত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলতে থাকে—এটার দাম প্রায় তিন হাজার টাকা! বাবা এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছেন! আমার জন্মদাতা বাবা! উনিশ শো উনসত্তর সালের মাঝামাঝি। আর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কার সঙ্গে জানিস? বিশুর সঙ্গে। দয়াল শা'র সঙ্গে।

বিশুর সঙ্গে ? চমকে ওঠে রেণু।

হ্যাঁ, বিশুর সঙ্গে !

কিন্তু বাবা যে তখন বলতেন তুই নাকি ওর সঙ্গে জুটে গিয়েছিস ! বাবা যে কত দুঃখ করতেন।

বাবা দুঃখ করতেন ? হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে হা-হা করে হেসে উঠে টুনু। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে হাসে। তারপর নিজেকে যেন কোন রকমে সামলে নেয়। দিদির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলে, অমন করে তাকাচ্ছিস কেন ? ভাবছিস মদের ঘোরে মাতলামি করছি ? না না তা নয়, মদ আমি খেয়েছি সত্যি, কিন্তু মাতাল হইনি ! এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ! বাবা আমার জন্যে দুঃখ করতেন ! ইউ ফুল ! বাবা তোকেও বোকা বানিয়েছে। আমাকেও। এবং কেন জানিস ? টু কিপ হিজ ওন এক্সজিস্টেন্স। ইয়েস ত্থাট ইজ রাইট ইন অল দি কেস। বিশু, মণ্টু, দামু, হাতকাটা ক্যাবলা, এই আমি, আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। বিশু নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে। আমরা কিসসু বুঝতে পারিনি। আমরা সব দয়াল শা'র এজেণ্ট ছিলাম। প্রতিরাতে আমাদের টাকা দেওয়া হতো। রাত জাগার ওষুধ হিসাবে বিলীতি দেওয়া হতো। এবং তার পরিবর্তে দেওয়ালে লিখতাম তাদের লিখে দেওয়া শ্লোগান। কোন্ শালা কোথাকার চ্যায়ারম্যান, কে যুগ যুগ বাঁচবে, আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব ছিলনা, শুধু লেখ, আর লেখ।

রেণু যেন কেমন ভয় পেয়ে যায়। টুনুর খুব কাছে এসে বলে, টুনু তুই এবার যা, শোগে যা। কাল আবার শুনব। তুই যা ভাই।

উঁহুঁ। জবাব যখন চাইলিই, তখন চুপ আমি আর করছিনা। তুই আমাকে বলতে দে দিদি। টুনুর চোখ ক্রমশঃ উদাস হয়ে ওঠে।

রেণু কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। টুনু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, বিশু প্রথম যেদিন রানীগঞ্জের সুরেন নিয়োগীকে গুলি করলো, দয়াল শা'র সেদিন নিজে আমাদের আস্তানায় হাজির ছিল। সংবাদ পাবার জন্য সে কি তার উৎকণ্ঠা। হ্যাঁ, এই সেই দয়াল শা। প্রাক্তন এম. এল. এ.। ডেমো-কোয়ার একজন মস্ত বড় পাণ্ডা। এবং আবার শুনছি বাহাত্তর সালেও নাকি ওই দাঁড়াবে।

রেণু কি ক্রমশই সাহস হারিয়ে ফেলছে? ওকি কোন কথার জবাবই দিতে পারবে না? শুনতে শুনতে কেমন যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলছে। রেণু কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার আগেই টুনু আবার প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা তুই সারাফতকে কবে থেকে চিনিস? সারাফত কি করে জানিস?

রেণু যেন এমনি একটা প্রশ্নের জন্যে মোটেও তৈরী ছিল না। বলে, ওতো বাবার কাছে কেইস নিয়ে আসতো। সেই থেকে বাবাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বাবার মোটা মক্কেল বলে।

—কি কেস ছিল জানিস সেই মক্কেলটির?

—উঁহুঁ।

আচ্ছা থাক ওসব। জানার দরকার নেই। পরে জানবি। তবে শুনে রাখ, কয়েকদিনের মধ্যেই হয় সারাফত নয় আমি দুজনের মধ্যে একজন শেষ হয়ে যাব। রেণু যেন নাটক শুনছে। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় ওর চোখমুখ।

টুনু আবার বলতে শুরু করে, বিশ্বাস করিস আর না করিস এটাই ঘটনা। ওই সারাফতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় দয়াল শা'ই। হ্যাঁ, শোন আরও একটা কথা তোকে জানিয়ে দিই। মাঝে নামো পাড়ার কালচারাল ইউনিটে আমরা সবাই নাম লিখিয়েছিলাম। কেন জানিস, বেটাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই, কোন বিষয়েই মিল নেই, তবু ওদের মধ্যে যোগ দিতে

আমাদের বাধ্য করেছিল। টাকা-পয়সা সব দিত দয়াল শা। আমরা কেবল তার আজ্ঞাবহ মাত্র। অবশ্য বেশী দিন আমরা কেউই সেখানে থাকতে পারিনি। বোধ হয় ওরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল কিছুদিন বাদ একে একে আমাদের সবাইকেই তাড়িয়েছে। সবার শেষে তাড়িয়েছে আমাকে।

রেণু এবার যেন কিছুটা বুঝতে পারে, জিজ্ঞেস করে, তাই নিয়েই কি দিগেনদের সঙ্গে তোদের ঝগড়া?

—হ্যাঁ।

তবে এখন ওই শালাকে পেলেও খতম করার নির্দেশ আমরা পেয়ে গেছি। বুঝেছিস তো, এখন আমরা সব আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। ওপর থেকে নির্দেশ আসে আমরা পালন করি, ব্যাস্। বেশ আছি। পয়সার অভাব নেই, খাও, নাচো মোচ কর আবার কি? যার যতো দরকার নাও। কোন পরোয়া নেই। কিন্তু যা বলা হবে তাই করতে হবে। তো এবার বল, এরপর যদি জবাব দেওয়ার থাকে তো, কে দেবে, আমি না বাবা? আমার নামে যদি কেউ দেয়ালে পোষ্টার ফেলে তার জন্যে আমি দায়ী না বাবা? আজ যদি আমি মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করি তো তার লাইসেন্স কে দিয়েছে, আমি নিজে না বাবা। বলতে বলতে কেমন যে নাটকের নায়কের মতোই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে যায় টুনু। রেণু আরও ভয় পেয়ে যায়। সে সঙ্গে কেমন যেন একটা ঘৃণার চাপ তাকে ক্রমশঃ শিথিল করে আনে। টুনু না থামলে ঘৃণায় ভয়ে এক্ষুণি রেণু বুঝি হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলবে। ভয়ে ভয়েই রেণু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, তুই এবার থাম লক্ষীটি। আমি আর শুনতে চাই না। তোর কাছে জোর হাতে ক্ষমা চাইছি। টুনু, তুই শুধু একবার আমার কথা শোন।

টুনু ম্লান হাসে, বেশ আর বলব না। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আর যখন জানার তোর দরকার নেই তখন আর

বলব না। বলা শেষ হওয়ার আগেই টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রেণু ধপ করে বসে পড়ে। স্থাণুর মতো অনেকক্ষণ ধরে ওই চেয়ারটার মধ্যে বসে থাকে। কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। একবার ভাবে টুনু যা বলে গেল তা কি সবিই সত্যি? না টুনুর বানানো। আবার ভাবে টুনুকে বাবা সব সময়ে এড়িয়ে যায় কি এসব ঘটনার জন্যই। এসব ঘটনার জন্যেই কি বাবা কোনদিন টুনুকে সামনাসামনি কোন কথা বলতে পারে না? হয়তো এটাই সত্যি।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই করুণায় ভরে ওঠে রেণুর মন। বড্ড অসহায় মনে হয় টুনুকে। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায়। টুনু ঘরের দরজা দেয়নি, বাতি পর্যন্ত নেভায় নি। কোন রকমে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। ক্লান্তিতে মুখটা একটু হা হয়ে গেছে। এক গাল দাঁড়ি গোফ তার চেহারাটাকে যেন আরও করুণ করে তুলেছে।

রেণু একবার ভাবল, ওকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করে, তুই আবার ভালো হতে পারিস না টুনু।

কিন্তু সেই লোভ সামলে নিল। আস্তে আস্তে ভাই-এর মাথার শিয়রে এসে বসলো। আলতোভাবে জামার বোতাম কয়টা খুলে দিল, তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এইক্ষণে রেণু বুঝি মা হয়ে গেছে! অনেকক্ষণ ধরে রেণু তার অসহায় ভাই-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলো।

টুনুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে কোন শব্দ করলো না। আঃ, অনেকদিন কেউ তাকে এভাবে সস্নেহে আদর করেনি, কেউ তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়নি। মুহূর্তের মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। নীরবে চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলো গরম জলের ধারা। কোন সেই ছেলেবেলায়ে এমনি করেই মা তাকে

ঘুম পাড়িয়ে দিত। আহারে! সে যদি আবার শিশু হতে পারতো, আবার যদি সে তার পুরনো দিনগুলি ফিরে পেত? আচ্ছা, সত্যিই চেষ্টা করলে কি টুনু আবার ভাল হয়ে যেতে পারে না?

এক সময় রেণু উঠে এল। মনের ওর ঘৃণা, ক্ষোভ ব্যথা বেদনা সব বুঝি নিমেষে উবে গেছে। উপরন্তু বাবার উপর যে শ্রদ্ধা এতদিন ছিল তাতে ফাটল দেখা দিল ভয়ানক ভাবে।

অন্যদিন বেশ দেরী করেই ওঠে টুনু। আজ যেন আরও দেরী হলো। অন্যান্য দিন ঘুম থেকে উঠেই কোন রকমে চওড়া বেল্ট কোমড়ে এঁটে সটান খাবার টেবিলে। যা পেল খেয়ে-দেয়ে গটগট করে বেরিয়ে যায় টুনু। কিন্তু আজ আর তা করলোনা। ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানা ছাড়লো না। বিছানার উপর উঠে হাঁটুতে মুখ গুঁজে জানালার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল টুনু। মনে তার এখনও তোলপাড়। এখনও নানান উথালি পাথালি।

দেরী দেখেই বোধ হয় বাবু টুনুকে ডাকতে এসেছে। নিচে পরেশ উকিলের চ্যাম্বারের আশে পাশে দু-তিন বার উঁকি দিল। কিন্তু কারোই দেখা পেলনা। তারপর অন্যদিন যা করে তাই করল। ঘুরে গিয়ে একেবারে পেছনের দিকে খোলা দোতলার জানালা লক্ষ্য করে মুখে দু-আঙুল পুরেই কষে এক শিষ।

টুনু জানালার কাছে সরে এল, চোখাচোখি হতেই হাতে ইশারা করে বলল, দাঁড়া, আমি আসছি এখুনি।

বাবুকে দেখেই যেন প্রোগ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। এগারটার মধ্যে ও. সি. মিঃ নিবারণ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি ওদের ডেকে পাঠিয়েছেন খুব জরুরী দরকার। কি একটা এ্যাকশনের ব্যাপার আছে।

কোন রকমে মোজা গলিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ হতেই মুখ তুলে দেখতে পেল রেণু তার সামনেই দাঁড়িয়ে।

চোখে চোখ পড়তেই রেণু জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—একটু কাজ আছে বাইরে যেতে হবে।

রেণু বাধা দেবার চেষ্টা করে, না আজ তোর কোথাও যাওয়া হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়ায় টুনু, ম্লান হাসে, যেতে আমাকে হবেই। যেখান থেকে খবর এসেছে না গিয়ে কোন উপায় নেই।

আমি যদি যেতে না দিই।

—তবু যেতে হবে। বেঁচে থাকার জন্যেই যেতে হবে। তুই বাধা দিস না দিদি। আমার আজ আর কোন উপায় নেই।

রেণু আর কিছুই বলল না। টুনুর চলে যাওয়া গতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

এর মধ্যে সমস্ত মহকুমা এলাকায় পর পর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। সে সঙ্গে শহর অঞ্চলে ঘটল দুটো ঘটনা। দৈনন্দিন বয়ে যাওয়া জীবন গতিতে যার ফলে অনেক ওলটপালট দেখা দিল। প্রাথমিক ভাবে সাধারণ মানুষ এর জন্যে একদম তৈরী ছিল না, কিন্তু ঘটনা ঘটতে থাকলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামলে নেবার জন্য সব মানুষই উঠে পড়ে লেগে গেল। কারণ প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই আঘাত হেনেছিল মানুষ নিরাপদ ভাবে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা তার উপর। বেঁচে থাকতে পারবে কিনা তাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে মানুষের মতই। কিংবা দাসত্বের পায়ে নিজেদের বলি দিয়ে শাসক শ্রেণীর লাগামটা নিজেদের মুখে এঁটে দেবে। সুতরাং ভাবতে তাদের হলোই।

ইতিমধ্যে সরকারী স্তরে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা নেওয়া হলো। মহকুমা শাসককে বদলি করে নতুন একজন মহকুমা শাসক বসানো হলো যার সততা বলে কোন বস্তু নেই। একজন সহকারী জেলা-শাসক বসানো হলো যিনি যুদ্ধ ফেরতা এবং একজন অতিরিক্ত

পুলিশ স্থপার আনা হলো যিনি জেলা পুলিশ স্থপারের ভীষণ পেয়ারের লোক। এক পাত্রের দোস্ত।

এই অতিরিক্ত পুলিশ স্থপার মিঃ সান্যাল এসেই হুকুম দিলেন, ওসব আইন-কানুন ছাড়ুন। যা দরকার তাই করুন। কিন্তু কোন অঞ্চলেই কোন মিছিল, মিটিং সভা এসব করা চলবেনা। সেগুলোকে যেভাবে পারেন বন্ধ করতে হবে। না পারেন চাকরী ছেড়ে দিয়ে বৌ-এর আঁচল ধরে রাত কাটান গে।

থানার দারোগা নিবারণ মিত্র হাতের রুলটা দিয়ে নাকের ডগ চুলকাতে চুলকাতে বললেন, স্যার, দোষটা আমাদের দেবেন না। আমাদের হাত-পা প্র্যাকটিকেলি বেঁধে রাখা হয়েছে। কিসসু করার জো নেই। যদি আপনারা একটু সাহস দেন, যদি আমরা একটু ফ্রি হ্যাণ্ড পাই তো চব্বিশ ঘণ্টায় পিটিয়ে সব লাশ বানিয়ে দিতে পারি।

—বেশ সেটাই আমি চাই! কিন্তু এর পর যেন শুনতে না পাই অমুক ঘেরাও হয়েছে। অমুক কারখানায় শূয়রের বাচ্চাদের হুজ্জুতে কাজ করা যাচ্ছে না। তাহলে সর্বনাশ করে দেব।

—এইবার একবার দেখুন না স্যার। প্রায় বিগলিত কণ্ঠেই উত্তর আসে।

হ্যাঁ, দেখবার জন্যেই তো এসেছি! কিন্তু অফিসের ভেতর ওগুলো কি হচ্ছে? বোতলটোতলগুলো একটু আড়ালে সাবধানে রাখা যায় না! কি ব্যাপার! বোতল দেখি অনেকগুলোই শেষ। কিন্তু এতবড় ঘটনাটা কিভাবে ঘটতে পারলো? ডি. এস.-কে দু' দিন ধরে অতগুলো লোক ঘিরে রাখল কি করে? গুলিটুলি ছিলনা? এমন ঘটনা ঘটতে পারলো কেন যার জন্যে দিল্লী পর্যন্ত ক্ষেপে গেল?

মাথা চুলকায় নিবারণ মিত্র।

মিঃ সান্যাল আরও কিছুক্ষণ গালাগালি করলেন। তারপর যেমন

দ্রুতগতিতে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ঝড়ের গতিতে ঝাঁপে চেপে বসলেন।

মিত্তির দাঁতে দাঁত চেপে ফুঁসে ওঠে, শালা। সাধুর বাচ্চা। তবুও যদি না জানতাম। পরক্ষণে চেয়ারের ওপর ধপাস করে বসে বাঁ দিকে ঘুরে নান্টু দারোগাকে শোনায়, জানো বর্ধমানে ওই শালা অফিসে মেয়ে পর্যন্ত ঢোকায়।

হে হে করে হেসে ওঠে নান্টু দারোগা, তা আর জানিনা। দুর্গাপুরের মেমটা কোথাকার ছিল? কর্তারা কষ্টিনষ্টি করলে কোন দোষ নেই। বুঝলে না, যতো অপরাধ আমাদের বেলায়। বেশী মেজাজ দেখালে, দেব চিতিয়ে। তুমি চুপ করে সব শুনে যাওনা। তারপর কি করতে হয় আমরা আছি। বেশী হুড়ুম দাড়ুম করলে এইসা আছোলা ঝাড়ব, বেটা যাতে বাপ বাপ করে মাগীর কোলেই ফিরে যায়।

দুজনেই খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে থাকে বিষাক্ত ভাবে।

এবং সুরুটাও হয়ে যায় এরপর থেকেই। আগে টুকটাক যা চলছিল তাতে কর্তৃপক্ষ খুশী নন। বিশেষ করে সামনে আবার নির্বাচন। তার আগে অবস্থাটা যে ভাবেই হোক পালটাতে হবে। এতদ অঞ্চল বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। স্বভাবতই শাসক গোষ্ঠী সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত। এখানকার সাধারণ মানুষগুলিও যেন ইস্পাত দিয়েই গড়া। যেমন ইস্পাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কঠিন শক্ত ইস্পাত গলিয়ে যেমন খুশী আকার দিতে সমর্থ। তেমনি তাদের অস্থি মজ্জায়ও যেন সেই ইস্পাতি ঢং। ইস্পাতি গড়ন।

সুতরাং রাতারাতি তাদের লৌহ দৃঢ় সংগঠনগুলি যদি ভেঙে গুঁড়িয়ে না দেওয়া যায় তো তাদের রায় কোন দিকে যাবে তা তারা জানে। অতএব প্রয়োজনেই অতি ব্যস্ততা।

এলাকার একমাত্র কাপড়ের মিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল

অনেক দিন। নানা প্রচেষ্টার পরেও আর কোন কারখানা কিংবা মিল-কোলিয়ারী বন্ধ করতে পারেনি। কাপড়ের মিলের শিক্ষা শ্রমিকদের অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। তাঁরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এবার অদৃশ্য ইঙ্গিত সব বেড়া যেন এক মোচড়েই ভেঙে দিল—সামলা-কেন্দা, নিমচা, মনোহরবাল কোলিয়ারী পরপর বিনা নোটিশে, বিনা কৈফিয়তে বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা লাগাতর অবস্থান চালালো। এছাড়াও ছোট বড় কারখানা অনেক-গুলো পরপর হয় লক আউট নয়তো ক্লোজার হয়ে গেল। মজদুর ভাইরা সিংহ বিক্রমে গর্জে উঠল—প্রতিরোধ চাই। বেঁচে থাকতে চাই। শ্রমিক ছাঁটাই চলবে না। কেঁপে উঠল সমস্ত অঞ্চলটা। একদিকে সরকার এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকাধীন কারখানা-গুলির কর্তৃপক্ষ অনড়।

অবস্থা দেখে নেতৃত্বও সচেতন হয়ে উঠল, কার্যকরী সমিতি বসে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে সুরু করে দিলেন। বিপিনদা স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, কমরেড্‌স এবার সতর্ক হোন। আর বসে থাকলে হবেনা। একদিকে উগ্রপন্থী রাজনীতির আমদানী, অন্যদিকে কথায় কথায় কারখানা বন্ধ। এর পেছনে রয়েছে ব্যাপক ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই রুখতে হবে! আর যদি না পরেন তো মনে রাখবেন নিজেদের কোন অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারবেন না। নিজেরা এলাকায় এলাকায় কর্মীদের নিয়ে বসুন। ওদের সমস্ত ব্যাপারটা ওয়াকেবহাল করান। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুতি চালান। মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীকে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধ করে তুলুন।

একবাক্যে সকলেই এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রয়োজনবোধে কোথাও সাময়িক ভাবে মানিয়েও নিতে হবে। আবার কোথাও কোথাও পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে। সভায় আরও

স্থির হলো গণতান্ত্রিক বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির এখুনি একটা কমভেনশন ডাকা হবে।

নিবারণ মিত্তির তিন স্তরের একটা ছক কাটলেন। নান্নু দারোগা সহ টিমের সকলেই বললে একেবারে পাকা পরিকল্পনা। পর পর এ ক'টা কাজ করতে পারলেই মোটামুটি এলাকা হাতে এসে যাবে।

বিশেষ করে সুদীপ্ত সেন কাঠগোলা-হর্কাস ইত্যাদি দিয়ে যেভাবে শহরটা কাঁপিয়ে রাখছে তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়া। দ্বিতীয় ছক হলো রেলওয়ে সংগঠনে আচমকা আঘাত হানা। তৃতীয় বিষয়টা হলো ওদের এলাকাগুলি সব সময়ে হামলা করে অস্থির করে তোলা, যাতে নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত থাকে। যাতে নিজেদের রুজী-রোজগারের কথা ভাবতেই সময় কেটে যায়।

পরিকল্পনাটা প্রায় সকলেরই মনঃপূত হলো!

শেষ আঘাত হিসেবে ওরা এলাকার সাইকেল কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য করল। অজুহাত, শ্রমিক অশান্তি এবং ছাঁটাই মেনে না নেওয়া। সারা অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গী সংগঠন এই সাইকেল কারখানাটি।

ডাইরেক্টর পরিষ্কার ঘোষণা করে দিলেন, ছাঁটাই মেনে নিন, নয়তো চালাতে পারবনা।

ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই অবান্তর প্রস্তাব সিকেয় তুলে রেখে কাঁচামাল যাতে কেন্দ্রের হাত থেকে আদায় করা যায় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। চেষ্টা করুন যাতে বাইরের অর্ডার এই কারখানাটিও পায়। কিন্তু পারবেন কি দিল্লীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে?

মালিকপক্ষ অত যুক্তিটুক্তি মানতে রাজী নন। তাঁদের এক কথা, বন্ধ কারখানা হবেই।

শ্রমিক ভাইরা বললেন, আমরা প্রাণ দিয়ে তা রুখব।

শান্ত মহকুমা এক তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে যেন নড়ে উঠল। দিকে দিকে শ্রমিকদের সংগঠিত মিছিল, সভা, অবস্থান বিক্ষোভ ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে লাগলো। প্রায় প্রতি দিনই শহরের বুক কাঁপিয়ে ঝড়ের মতো সংগঠিত হতে লাগলো মিছিল কিংবা সভা।

সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষেপে গেল। একি ব্যাপার, এক ডি. এসকে ঘেরাও নিয়ে যে ভাবে প্রশাসন যন্ত্রের পরিবর্তন ঘটানো হলো, অথচ এযে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সাধারণ মানুষের কি ক্ষয় নেই। এক মারা হয়, তো একশ জমায়েত। একশজনের অবস্থান ভাঙা হয়তো হাজারো মানুষের অবস্থান। হাজার খানেক এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফলই হলনা।

থানার ও. সি. মিঃ নিবারণ মিত্র ভীষণ ক্লান্ত। প্রায় এক নিশ্বাসেই হুইসকির বোতলটা গলায় ঢেলে দিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, চিৎকার করতে থাকে—সিপাই, নানু সাব কো বোলাও!

নানু দারোগা বাইরেই অপেক্ষা করছিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে পড়ে। ওকেও ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বহুদিন এক সঙ্গে চাকরী করছে নানুঘোষ, ও. সি. মিত্তিরের সঙ্গে। কিন্তু আজ আর কোন ভদ্রতার আবরণই রাখতে পারলো না মিত্তির। প্রায় ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, কি হলো নানু, তোমার আণ্ডারে এত সি. আর. পি. দেওয়া হলো, কিন্তু কি করছ তুমি? আজ পর্যন্ত একটাও সাকসেসফুল অপারেশন করতে পারলে না।

কি করবো তুমিই বলো, অসহায়ের মতো এলিয়ে পড়ে নানু দারোগো, পেটানো তো আর কম হচ্ছেনা। গরু পেটানো হচ্ছে। কিন্তু কমছে কই। শালারা রক্ত বীজের বংশধর। কোথা

থেকে যে পিলপিল করে বেরোয় দেখলে আমাদের জিভ শুকিয়ে যায়।

তুমি ধারণা করতে পারবেনা।

থামো, প্রায় ধমকেই থামিয়ে দেয় নান্নু দারোগাকে, আমাকে আর ধারনা শিখিও না। ওই শালা হারামির বাচ্চা দিগেন না জানি কে, ওকে ধরতে পারোনি। না পারলে ব্যাঙ্কের সেই ছোড়াটাকে!

না। পারলাম না। কিন্তু ট্রাইতো করছি। শালারা যেন ম্যাজিক জানে।

না বলতে তোমাদের লজ্জা হয়না? খেঁকিয়ে ওঠে নিবারণ মিত্তির। একটা কুত্তার বাচ্চা তাকে এতগুলি ফোর্স ধরতে হিমসিম খেয়ে গেলে। অথচ আমি শুনেছি ওই শূয়ারটা এই শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কাজ সে ঠিক করে যাচ্ছে। ওকি ডনযোয়ান নাকি? যত্তো সব অকম্মার ঢেঁকী। সেদিন কাঠগোলা ইউনিয়নের সামনে তোমরা পেয়েও তাকে কিছু করতে পারলে না।

নান্নু দারোগা ভেতরে ভেতরে দাঁত কিড়মিড় করে, খুব ওপরওয়ালাগিরী ফলাচ্ছ, ফলাও যতো দিন পারো! মোকা পেলে আমিও দেখে নেব। এতই যদি হিম্মত তো দু রাউণ্ড ঘুরে এলেই হয়।

নিবারণ মিত্তির আরও এক হাত নেবার জন্যে তৈরী হয়। কিন্তু নান্নু দারোগার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ নরম হয়ে যায়, টেলিফোনটা তুলতে তুলতে বাঁ হাতে একটা কাগজ বাড়িয়ে দেয়, এই নাও ম্যাপটা, দেখে নাও। টুনু ঘোষের দল যাবে। শ্রী পল্লীর শেষের দিকে সুকান্ত পল্লীর সুরুতে একটা ডেন আছে। মেস বাড়ী করে থাকে। সন্ধ্যে আটটা নাগাদ হামলা হবে। বাকীটা বলে দিতে হবে নাকি?

মাথা নাড়ে নান্নু দারোগা।

নিবারণ মিত্তির আরও জানিয়ে দেয়, দরকার হলে রিজার্ভ

থেকে আরও কয়েকজন নিয়ে যাবে। আর টুনুদের সঙ্গেও সিভিল ড্রেসে আমাদের কিছু লোক থাকবে। সেমসাইড সম্বন্ধে সাবধান।

নান্নু দারোগা কোন কথা না বলেই যাবার জন্যে তৈরী হয়। নিবারণ মিত্তির ডেকে বলে, আর শোন, সাইকেল থেকে যাদের এনেছ তাদের কি কেস ডাইরী লেখা হয়ে গ্যাছে ?

না খানিকটে জায়গা ছাড়া আছে।

সব কটাকে তো এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্টেই দিয়েছ।

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে, এই নাও, এই দুটো নাম ও জুড়ে নিতে হবে। ছোট এক টুকরো কাগজের উপর লেখা নাম দুটো এগিয়ে দেয়। সুদীপ্ত সেন আর দিগেন বসু।

সুদীপ্ত ওই মেসেই থাকে। স্পটে পেলে তাকেও এ্যারেষ্ট করতে হবে।

নান্নু ঘোষ সমস্ত ঘটনাটাই বুঝতে পারে। কিছুই বাকী থাকেনা। ঘটনা সাজানো হচ্ছে। অন্যান্যবার নির্দেশ থাকে নেতৃত্বকে তুলে বন্ধ করে রেখে দাও। এবার কৌশল কিছু কিছু পালটেছে। এবার নির্দেশ হয়েছে লিডিং ক্যাডারদের তুলতে হবে। যারা নেতৃত্ব এবং সাধারণ ক্যাডারদের মধ্যে সংগঠক হিসেবে কাজ করে তাদেরকে যে কোন কেসে জড়িয়ে দিতে হবে। এবং এটা যদি সফলভাবে করা যায় তাহলেই বিরোধী সংগঠন পুরো পঙ্গু হয়ে যাবে।

নান্নু ঘোষ বেরিয়ে যেতেই নিবারণ মিত্তির আবার বোতলের ছিপি খোলে। অসহ্য, সেই বা কি করবে ? কাঁহাতক আর স্ব-জ্ঞানে মিথ্যে কথা লেখা যায় ? কত কত ঘটনা তৈরী করা যায়। মিশার কেসগুলি তো প্রায়ই কেঁচে যাচ্ছে। তার একমাত্র কারণ সময় পাওয়া যাচ্ছে না। সময় পেলে তবে তো মাথা ঠাণ্ডা করে ঘটনা

সাজানো চলে, যাতে সেটাকে বোর্ডের কাছে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু কোথায় সময়? একটা সাজাতে না সাজাতেই আরেকটা। সেটা শেষ হতে না হতেই আবার আরও একটা। একদিনের জন্যেও তর সয়না। এ পাড়ার যুব কর্তারা হুকুম দিচ্ছেন এ'কে ধরো, তো আবার ও পাড়ার নয়াকর্তারা হুকুম দিচ্ছেন ওকে সামলান মশায়। ড্যাস্., এটা একটা চাকরী হয়েছে নাকি? নেহাত অফুরন্ত উপরি, তাই। নয়তো কবে শালা পিসাব করে এলাহাবাদ চলে যেতাম। আনমনেই বিড়বিড় করতে থাকে নিবারণ মিত্তির।

খবর সুদীপ্তদের কাছেও ছিল। ওদের মেস এর মধ্যে যে কোন দিন আক্রমণ হতে পারে। কাঠগোলা ইউনিয়নের ঘটনায় যেভাবে অপদস্ত হয়েছিল তার বদলা যে কিংশুক-নিরঞ্জনের দল নেবে সে-দিনই তারা ঘোষণা করে দিয়েছিল। খবর আছে তা ছাড়াও, কিংশুক এবং নিরঞ্জন দাস নির্মল বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে মদদ চেয়েছে। সেখান থেকেই তারা চলে এসেছিল সোজা থানায়। সেই থানায় বসে বসেই পরিকল্পনা করা হয় কবে এবং কিভাবে সুদীপ্তদের মেস আক্রমণ করবে। টুনুদের সে ভাবেই খবর দেওয়া হয়েছে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক কমিটি ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঘটনাটা জোর রুখতে হবে। প্রথম ক্ষেপেই যদি রুখতে না পারে তো পরে আর এঁটে ওঠা সম্ভবই নয়। আর যদি একবার এখানে সফল হতে পারে তো অন্যত্র তখন দমে চালাবে। কারণ সুকান্ত পল্লী হচ্ছে সাংগঠনিক দিক থেকে অন্যতম শক্ত ঘাঁটি। সুকান্ত পল্লীর লোকাল ইউনিটকে নিয়ে বসার ভার পড়েছিল শঙ্করের ওপর। দিগেন তাকে সাহায্য করবে।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সবাই খবর পেয়ে গিয়েছিল। সভাটা প্রথম ভাবা হয়েছিল বর্ধিত সদস্যদের নিয়ে করা হবে। কিন্তু বিপিনদাই বাধা দিলেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বললেন, শোন, বৈধ-অবৈধ কাজের সমন্বয় যখনই করতে হবে তখন প্রাথমিক স্তরে দায়িত্বশীল কমরেডদের নিয়ে বসো। তারপর সিদ্ধান্তটা সাধারণ সভায় ঘোষণা করে দিলেই হবে। তা ছাড়া দ্রুত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ইউনিট নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে অবস্থা বুঝে।

সুদীপ্ত আগাগোড়া সমস্ত রিপোর্টটা রেখে গেল। পুলক, নিমাই, সুখেন্দু, বিনোদ সকলকেই একটু চিন্তিত মনে হলো। তাদের রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার বক্তব্য যা বেরিয়ে এলো, তা হলো ঝামেলা এড়ানোই উচিত। প্রয়োজন হলে মেস বাড়ী ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়া উচিত।

শঙ্করদা জিজ্ঞেস করেন, কোন জায়গাটা নিরাপদ কমরেড, একটু বলুন না শুনি। আর আজ যদি এখান থেকে পালাতে হয় তো কাল নিরাপদ জায়গা বলতে যা বোঝাচ্ছেন সেখান থেকেও পালাতে হবে।

সুদীপ্ত সাহসের সঙ্গে বলে, পালিয়ে-টালিয়ে যাওয়া হবে না কমরেড। প্রতিরোধ আমাদের করতেই হবে। বরঞ্চ কৌশলের দিক, প্রস্তুতির দিক নিয়ে আলোচনা করুন।

এবার পুলক আর নিমাই সুদীপ্তকে সমর্থন করে। কিন্তু সুখেন্দু আর বিনোদ যেন পাঁকাল মাছের মতো নরম মাটির ভেতর পালাবার চেষ্টা করছে।

শঙ্করদা কিছুক্ষণ ধরে অবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন, তারপর সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, কমরেড আপনাদের প্রতিরোধের জন্য তৈরী হতেই হবে। উর্ধ্বতন কমিটিরও তাই ইচ্ছে। এবার আপনারা কৌশলের দিকটা চিন্তা করুন। এ বিষয়ে কমরেড দিগেন আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন।

দিগেন এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। বিঁড়িটা আধ খাওয়া অবস্থায় নিভিয়ে একটু নড়ে চড়ে শুরু করলো, শুনুন কমরেড, খবরটা যখন পাওয়াই গেছে তখন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই এটাকে ভাবতে হবে। শত্রুর আক্রমণকে কখনই ছোট করে দেখলে চলবে না। তার জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতার দরকার। অপর দিকে আপনাদের সংগঠন আছে ঠিকই, তা বলে আত্মসচেতন না হয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না। এখন ধরুন এই অবস্থায় কি ভাবে শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে তাই ভাবতে হবে।

সকলেই বেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে দিগেনের কথাগুলো শুনছে। দিগেন যে সব সময় সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে তা নয়। কিন্তু আজ কেমন যেন একটা বক্তৃতার বেগ এসে গেছে! শঙ্করদা, দিগেন একটু থামতেই তারিফ করেন, আরম্ভটা ভালই হয়েছে, চালিয়ে যাও ভাই।

দিগেন একটু হেসে আবার সুরু করে, প্রথমেই ধরুন আমাদের মহিলা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আপনি, এই যে কমরেড সুখেন্দুকে বলছি, আপনি নিজে বাণী সিন্‌হার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কালই নিয়ে আসুন তাকে। তাকে দিয়ে লোকাল ইউনিটকে কাজে লাগান। তারপর দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে প্রস্তুতি চালাতে হবে শত্রুর গতিবিধির উপর যাতে আমরা তীব্র নজর রাখতে পারি। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে।

পুলক সায় দেয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জানাশোনা আছে কিনা?

হ্যাঁ। এই দিকটার দিকেও অবশ্যই জোর দিতে হবে। তারপর তৃতীয় পদ্ধতি হিসেবে বেটাদের মধ্যে হতাশা জাগিয়ে তুলতে হবে!

নিমাই-এর ঘুমে হাই উঠছিল, তুড়ি মেরে থামিয়ে বলে, এই হতাশাটা কি ভাবে জাগাতে হবে দিগাদা?

—কেন? গুণ্ডারা যদি আক্রমণ করতে আসে, আর প্রতিবারই

তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারি তাহলে তারা হতাশ হতে বাধ্য। এটা শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয়, শত্রুদের মধ্যে যদি হতাশা জাগিয়ে তোলা যায় তা হলে সর্ব যুদ্ধক্ষেত্রেই এটা নীতি হিসেবে প্রযোজ্য। আচ্ছা, যা বলছিলাম এরপর হবে প্রতিরোধের ব্যাপারটা। এটাকে মোটামুটি এ ভাবে ভাগ করে নেওয়া যাক কমরেড, প্রথমেই ধরুন গুণ্ডারা যদি এককভাবে আসে তো দরকার হলে চরম পথ নিতে দ্বিধা করলে চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, রিজার্ভ ফোর্স এলে সংঘাত এড়িয়ে যেতে হবে। কখনও এগিয়ে কখনও পিছিয়ে আক্রমণ রুখতেই হবে। তার জন্যে আপনাদের ভলান্টিয়ারদের ছোট ছোট কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে নিতে হবে।

প্রায় সমস্ত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করার পর দিগেন থামে। এক নাগাড়ে এর আগে এত কথা বলেছে বলে মনে পড়েনা। প্রাণপণে অক্সিজেন টেনে নেয় দিগেন শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে।

পুলকের অনেকক্ষণ ধরে শুনে শুনে বেশ ঝোঁক এসে গেছে। দিগেনের কথাগুলো তার মনে বেশ দাগ কাটে। সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কেউ এই এলাকায় থাকুন না এই ক'দিন।

সুদীপ্ত আশ্বাস দেয়, সে ব্যবস্থা হয়েছে। দিগেন এখানে এসে যাতে ঐক'দিন থাকতে পারে তার জন্যে বিপিনদাকে বলে মত করাবো।

প্রায় এক বাক্যে সায় দিয়ে ওঠে সবাই, ঠিক আছে এই ব্যবস্থাটা করতেই হবে।

শঙ্কর চৌধুরীও কথা দেয়, তিনিও যতদূর পারেন সাহায্য করবেন।

শেষ পর্যন্ত সেই দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত এসেই গেল। ছেলেরা মোটামুটি ঠিক নজর রেখেছিল। দুপুর থেকেই কয়েক বার পুলিশ

ভ্যান পাক খেয়েছে। জীপে করে নান্টু দারোগা কোর্ট মোড়ে আর না হোক ছ' সাত বার এসেছে গিয়েছে। কালো ভ্যানটা ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। খয়েরী রঙের ভ্যানটাও, যেটার সামনের দিকের কাঁচটা ভেঙে চুরমার সেটাও দু-তিনবার এলো গেলো।

টুনু ঘোষ নিবারণ মিত্তিরকে কথা দিয়েছে, ও ঠিক ম্যানেজ করে দেবে। পুলিশ-টুলিশ দরকার হবেনা।

নিবারণ মিত্তির টুনুর পিঠ চাপড়ে দিয়েছে, বুঝলিনা, সারাফতকে লাগাতে পারতাম। কিন্তু ও হারামীরা হলো গিয়ে ওয়াগন ভাঙার দল। অত সিরিয়াসলি চিন্তা করবেনা। দায়িত্ব বোধ কম। সে জন্যেই তোর ওপর ভরসা। কুত্তার বাচ্চারা আমাদের দেশে থাকবে, আমাদের দেশে খাবে আর জয়গান করবে চীনের। এখন আবার চীন ছেড়ে ভিয়েৎনাম ধরেছে। রুমানিয়া ধরেছে। ওরে বাবা চলে যা-না সেখানে। এখানে কেন?

টুনু দাঁত কিড়মিড় করে, দেখুন না বড়বাবু, ব্যাটাদের সব আজ পেঁদিয়ে চীনে পাঠাব। চীন না হোক কমছে কম বেন্দাবন তো বটেই!

দ্যাট আই বিলিভ। আমাদের লোকদের চেয়েও তোদের ওপর অনেক বেশী ভরসা করা যায়। তুই একবার দু এক দিন ঘোরাঘুরি করে বরঞ্চ গলি টলি গুলো দেখে আয়। নবোদয় সংঘের কাছে গিয়েছিলি তো?

টুনু ঘোষ উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, কবে। নবোদয় গোটা তিরিশ লোক দেবে বলেছে। কিন্তু বড়বাবু, পেটোর নাম্বারটা একটু কম হয়ে গেল। আরও যদি বেশী পাওয়ারের দু-তিনটে দিতেন তো ভালো হতো।

সে সম্বন্ধে ভাবতে হবে না। খয়েরী রঙের আমাদের ভ্যানটার সঙ্গে দরকার পড়লে যোগাযোগ করবি। সব ব্যবস্থা

আছে। তা ছাড়াও আমাদের অপারেশন স্কোয়াডও একটা থাকছে।

সেলাম ঠুকে বেরিয়ে এসেছিল টুনু ঘোষ।

খবরটা ফিস ফিস করে প্রায় সব ঘরেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাদের যা করণীয় তাও বলে দেওয়া হয়েছিল। শুধু ঠিক হয়েছিল নামো পাড়ার আর সুকান্ত পল্লীর মাঝামাঝি ফাঁকা মাঠটায় আশু আর ফড়িং সাহেবদের দেওয়ালের পেছনে লুকিয়ে সিগন্যাল দিয়ে যাবে। বার্নপুরের দিকে থাকবে নটোবর আর মন্টু। বি. এন. আর. ব্রিজের গোড়ায় থাকবে ইউসুফ আর পুলক। চেনা মুখ যেন একটাও প্রকাশ্যে না থাকে।

বাকী ব্যবস্থা সব পাকা। কথামতো ব্যবস্থা হলো শুধু গুণ্ডার দল হলে মুখোমুখি লড়তে হবে। এমন কি সাদা পোষাকের পুলিশ থাকলেও। কিন্তু রিজার্ভ পুলিশ, আর ইউনিফর্ম পুলিশ থাকলে একশন স্কোয়ড এগুবে না। মেয়েরা এগুবে।

কিন্তু রুখতেই হবে।

সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত যে থমথমে ভাবটা ছিল ক্রমশঃ সেটা যেন আরও বেশী থমথমে হয়ে উঠল। রাস্তায় সাধারণ মানুষের চলাফেরাও কমে এসেছে। ক্রমশঃই নদীপারের বিষণ্ণ নির্জনতার মতো সমস্ত সুকান্ত পল্লীটাই বুঝি দম বন্ধ করে ঘাপটি মেরে ওত পেতে রইল।

সুদীপ্তের মেসটা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল। পাশে দরজির দোকানের ছাদ থেকে লক্ষ্য রেখেছিল দিগেন আর আট দশটি ছেলে। ইউনিটের বাইরের বাতিটি নিভিয়ে ভেতরে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ভেতরে লোকজন আছে।

হটাৎ এলাকার সমস্ত আলোগুলোই নিভে গেল। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউএর মতো একরাশ অন্ধকার এসে সমস্ত পল্লী এবং তার

আশে পাশের অঞ্চল ডুবিয়ে দিল। বুক দুর দুর করে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো কখন কি হয়! মিনিট দশ পনের কেটে গেল কোন কিছুর দেখা নেই। দিগেন আর সুদীপ্ত, শঙ্কর আর নিমাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসে তার জন্যে। খোলা দু দিকেই সংকেত জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিগেনের নিশ্বাস ফেলার শব্দ সুদীপ্ত শুনতে পাচ্ছে। সুদীপ্তের ঘন সতর্ক নিশ্বাস পড়ছে দিগেনের কাঁধে। দিগেনের চোখ যেন অন্ধকারেও আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সাহেবদের মাঠের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ফিস ফিস করে সুদীপ্তকে বলে, ওই দেখ।

লাল আলোর সংকেত তখন ঘন ঘন কাঁপছে।

অল্প পরেই শোনা গেল ভারি ট্রাকের গম্ভীর আওয়াজ। রাস্তা ঘেঁষে ধীরে ধীরে শব্দটা ক্রমশঃই কাছাকাছি এগুতে লাগল। দিগেন বললে, তৈরী?

হ্যাঁ দিগাদা!

কিন্তু এখন নয়। সকলকে ঢুকতে দিতে হবে। তারপর ওদের শক্তি বুঝে ব্যবস্থা।

বুম্-ম্ বুম্ব। মুহূর্তের মধ্যে ঝলসে উঠেই বিকট শব্দে এক রাশ ধোঁয়া। তারপর একদম চুপ। না কোন সাড়াশব্দ নেই এ পক্ষ থেকে। মাঠটার মাঝামাঝি এসে থেমে গেল পর পর দুটো ট্রাক। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল চটপট কয়েকজন মানুষ নেমে এলো ডালা খুলে। সংখ্যায় বেশ কয়েকজন তারা। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ল।

দিগেন দাঁত কড়মড় করে, হুচুক পাড়ার দিক থেকে।

হুঁ, সুদীপ্ত বলে।

মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর বিকট চিৎকার করে ছুটে এলো সুকান্ত পল্লীর তিন দিক থেকে। মশালগুলো জ্বলে উঠল। সাধারণ বাসিন্দেরা দরজা বন্ধ করে প্রাণপণে চিৎকার করতে

লাগলো বাঁচাও বাঁচাও! বেপরোয়া পটকা পড়তে লাগল এদিক সেদিক। ধোঁয়া আর ধোঁয়া মাঝে মাঝে আগুনের ঝিলিক।

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, ষ্টার্ট? হুইসেল দেব?

দিগেন উত্তর দেয়, না আরও ঢুকতে দাও। আরও কিছু খরচ হোক ওদের মালমসল্লা। মনে হচ্ছে এক্ষুণিই পুলিশ ঝাঁপাবে না। আর পুলিশ যদি ওদের সঙ্গে না থাকে তো ও ক'টা গুণ্ডাকে ঘিরে ফেলে পিছু হটতে বাধ্য করতে বেশীক্ষণ লাগবে না।

বিকট উল্লাসে গুণ্ডার দল টুনু ঘোষের নেতৃত্বে আরও কিছুক্ষণ পটকা ফেললে। খোলা তলোয়ার আর ছোরা নিয়ে ছুটোছুটি মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। পথ চলতি সাধারণ নাগরিক যারা এ রাস্তায় যাতায়াত করছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘায়েলও হলো। মনে হলো জয়ের বিচিত্র উল্লাসে ওরা আরও কিছু করবে। বিশেষ করে হতাশ হয়ে পড়েছিল মেস বাড়ীটা একদম ফাঁকা হওয়ায়। জিনিসপত্র যা ছিল টেনে এনে এক জায়গায় জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। কয়েকটা ট্রাঙ্ক লুট হল আর সেই বহ্ন্যুৎসব হলো দামী দামী বইগুলোর, যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে রোমা রোলার জাঁ ক্রিস্তফ, টলষ্টয়, গোগুল, সেক্সপিয়ারের সব বইগুলি।

সুদীপ্ত একবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল। দিগেন সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে ধরে, বেয়াকুব, এক্ষুণি সব্বোনাশ করেছিলে।

কিন্তু দেখছ ওরা সব বইগুলি জ্বালিয়ে দিলে।

দিক। সভ্যযুগের মানুষ দেখুক।

ঘণ্টা খানেক ভুলকালাম চলার পর ক্লান্ত হয়ে পড়লো দলের লোকগুলো। মদের ঝোঁক কেটে আসতে লাগলো। টুনু চিৎকার করে হুকুম দিলে, এই বাবু, সবাইকে মাঠের দিকে পাঠিয়ে দে। ট্রাকে উঠে পড়বে ঝটপট। এই ট্যারা, এইনে এটা। শালাদের

লাল ঝাণ্ডাটা টেনে নামা। ওটাতে আগুন ধরিয়ে দে। তারপর তুলে দে আমাদেরটা। আর লিখে দিয়ে আয়, শালাদের অফিস দখল।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্যারা ছোটে। বাকী সবাই মাঠের দিকে। মিনিট দশ কি পনের আচমকা তীব্র শীষের মতো একটা শব্দ সুকান্ত পল্লীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। সবাই ঠিক এই শব্দটার জন্যেই বুঝি তৈরী হয়েছিল। চোখের নিমেষে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে গেল চার ধার। চারধার থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগলো মানুষগুলো। লাঠি সোটা, বললাম, সড়কি, দাঁ, বটি যার কাছে যা অস্ত্র ছিল। কেউ একটি প্রাণীও বুঝি ঘরে রইবে না। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা মাঠটার মধ্যে ট্রাক সমেত ঘিরে ফেললে গুণ্ডার দলটাকে।

ঠিক কোর্ট থেকে পেরিয়ে একটিই মাত্র রাস্তা সোজা এসে মিশেছে বুধা হয়ে হটন রোডে। পুলিশের গাড়ী যাতায়াতের একটিই মাত্র রাস্তা। দেখতে না দেখতে গাছের গুঁড়ি দিয়ে ব্যরিকেড করে ফেলা হলো মেন রোড। সংকেত পেয়েও পুলিশের গাড়ী আর এগুতে পারল না। নানু দারোগা ওয়ারলেস ভ্যান থেকে ঝাঁপিয়ে নেমেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করল থানার সঙ্গে।

ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে! প্রাণপণে মনের ইচ্ছেমতো পেটা হলো গুণ্ডার দলকে। তাদের মধ্যে একজনও সুস্থ শরীরে ফিরে যেতে পারলো না! শুধু টুনু ঘোষ তার রিভলবার থেকে বেধড়কগুলি চালাতে চালাতে আম বাগানের মধ্য দিয়ে মিলিয়ে গেল।

পরদিন সারা শহরেই ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটা। বিশেষ করে মাইকে যখন বারো ঘণ্টার কার্ফু ঘোষণা করা হলো তখন আর

কারো বুঝতে বাকী রইল না গুণ্ডার দল তা হলে সত্যিই একটা ভয়ানক প্রতিরোধের মুখোমুখি পড়েছিল।

খবরটা পেয়ে বিপিনদা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিছু কিছু ঝিমিয়ে পড়া ইউনিট ও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে নিবারণ মিত্তির মাথার চুল ছিঁড়ে প্রতিজ্ঞা করলে, ব্যবস্থা সে এর একটা করবেই। এখন থেকে বেজন্মা টুনু ঘোষ বাতিল! দেখা যাক সারাফতকে দিয়ে কতটা কি করা যায়। কারণ একই পদ্ধতিতে সাইকেল কারখানায় সারাফতই অনেকটা কার্যকরী করে ফেলেছে। আর দু-চার দিনের মধ্যেই ওরা সম্পূর্ণ দখল নিতে পারবে। নেহাত প্রকাশ্যে একটা খতম হয়ে গেল। সুতরাং দিন ক' একটু টেনে চলতে হবে। নয়তো কোন দিনই পূর্ণাঙ্গ দখল হয়ে যেত! সুতরাং এবার সারাফত!

টুনু ঘোষ সেই যে ওপরে উঠেছে আর নিচে নামতে সাহস পাচ্ছে না। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ও। সর্বদাই মনে হচ্ছে কে যেন ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুকে সে দেখে এসেছে প্রায় হাতে নাতে। যে ভাবে ঘেরাও হয়েছিল, সত্যিই বাঁচার কোন পথ তার ছিলনা। নেহাতই বরাত জোর। সামনে কাল কেউটে দেখে যেমন ভাবে হিম শীতল হয়ে আসে, তেম্নি প্রায় ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল ওর সমস্ত শরীরটা। ক্রমশই অবশ হয়ে আসছিল। বাঁচার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবেই হঠাৎ বেপরোয়া ভাবে চালাতে শুরু করেছিল তার পিস্তলটা। এবং সেই ফাঁকেই কোন রকমে দে ছুট। বর্শার চকচকে ফলাটা আরেকটু হলেই ওকে বিঁধে ফেলত। প্রায় উড়ন্ত পাখীর মতো পায়ের কাছে এসে ছোঁ মেরে পড়েছিল। সে এক ভয়ঙ্কর রেহাই।

জীবনে আর ও মুখো হতে পারবে না টুনু ঘোষ। 'বেইমানের

বাচ্চা' নিজের মনেই বিড় বিড় করে ওঠে টুনু। শালা, পুলিশ রাখবে বলেছিল, উঃ, আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি !

সিভিল পোষাকে যে ক'টা ছিল, তারাও তো নিজেদের পরাণ সামলাতে ব্যস্ত !

নরেশ উকিল একদিনের জন্যেও ওপরে এলেন না। ডাক্তার ডাকা, নার্সের ব্যবস্থা করা, ওষুধ পথ্য সব রেণু। দশ বারো দিনেও যখন জ্বরের বিরতি হলো না। কেমন যেন ঘাবড়ে গেল রেণু !

টুনু দুর্বল ভাবে দিদিকে ডেকে বলে, আমি বোধ হয় আর বাঁচবনা দিদি !

ছি, অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই ! তোর কি কষ্ট হচ্ছে বল। ডাক্তার বাবুকে বললে ঠিক হয়ে যাবে।

টুনু চট্‌চটে লালা জড়িত জিভটা দিয়ে বার দুই মুখের মধ্যেই চিবুবার মতো শব্দ করলো, তারপর বিকৃত স্বরে বলে উঠল, কি একটা ভয়। চোখ বুঝলেই দেখতে পাই লোকগুলো আমাকে তাড়া করছে। উফ্, ওই ভীষণ অন্ধকারেও ওদের চোখ কি জ্বলছিল ! যেন এক্ষুণি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। উফ্, দিদি, সে কি জিনিস ! তুই আমাকে বাঁচা !

বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে টুনু। রেণু আরও ঘাবড়ে যায়। ওর দুর্বল হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, বাবাকে বলব ?

বুঝি এ কথাটাই বলতে চাইছিল টুনু। বিমর্ষ গর্তে ঢোকা চোখ দুটো তুলে দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, বাবাকে বল, হয়তো বাবা সব ব্যবস্থা করতে পারবে। নইলে ভাল হলেও আমার রক্ষা নেই। এক দিকে এরা ! অন্যদিকে সারাফত আর নিবারণ মিত্তির ! কেউ-না কেউ বাঁচতে আমায় দেবেনা।

অসহ্য ছটফটানি টুনুকে আরও ক্লান্ত করে তুললো।

নরেশ বাবু রেণুর কাছে সব শুনে গম্ভীর ভাবে শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস

ছাড়লেন, হুঁম। ও ঠিকই বলেছে রেণু। এখান থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে বিপদ। দেখছি কি করতে পারি!

নরেশ বাবুর কপালে বলিরেখায় ভাবনার চিহ্ন দেখা দেয়। এতদিন যেন এত স্পষ্ট ছিলনা তা! রেণু লক্ষ্য করে বাবা ইদানীং কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর পায়চারি করেন। কি ভাবেন কে জানে? একদিন নিজেই নিজের পায়ে কুঠার বসিয়েছেন। তার থেকে মুক্তির পথ? হয়তো বা—

এর মধ্যে দয়াল শাকে একবার ডেকে পাঠালেন নরেশ উকিল। সকালের দিকে সামনের বাগানে পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাস গাছটার কাছে এসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে গাছটার উঁচু মাথাটা লক্ষ্য করছিলেন, অনেক উঁচু। অভ্যাস মতো লাঠিটা সঙ্গেই আছে। অন্য দিনের চেয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

ধবধবে সাদা রঙের গাড়ীটা প্রায় নিঃশব্দে এসে থেমে গেল। গট গট করে নেমে এলেন দয়াল শা, কি খবর হঠাৎ এত্তেলা!

—হঠাৎ? মানে ঠিক হঠাৎ নয়। কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। একটু আলোচনা,—শেষ না করেই তিনি চোখ তুলে তাকান দয়াল শার মুখের দিকে, চেম্বারে বসবে?

—আমার আপত্তি নেই। ব্যবস্থা থাকলে সকালেই হয়ে যাবে একটু। হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন দয়াল শা!

নরেশবাবু মাথা নত করেন, না ঘরে আমার ওসব পাট নেই। চলো একটু বসে নিই।

চেম্বারে ঢুকে ভেতরের দিকে দরজা বন্ধ করে দিয়েদিলেন। মোটা চুরুটের মাথাটা দেশলাই দিয়ে ফুটো করতে করতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই বলেন, এবার কি ভাবছ বলতো শা?

—কি সম্বন্ধে?

—এই যে চারধারে যা চলছে। এটা এবার বন্ধ হওয়া দরকার।

—তুমি ক্ষেপেছো! আশ্চর্যের সঙ্গে বলে ওঠেন দয়াল, এত দূর এগিয়ে এখন আর ফেরার কোন পথ নেই! তা ছাড়া জাহান্নামের হাত থেকে বাঁচতে হলে এরকম চালিয়ে যেতেই হবে। বুঝেছি, ছেলেটা তোমার বোধ হয় ভড়কে গেছে একটু বেশী। চলো একটু দেখে আসি!

না, বলিষ্ঠ গভীরতার সঙ্গে প্রতিবাদ করেন নরেশবাবু, ওর সামনে আমি যেতে পারব না। কিন্তু আমার দৃঢ় অভিমত এটা এক্ষুণি বন্ধ হওয়া দরকার।

হো হো করে হেসে ওঠেন দয়াল শা। তারপর হাসি থামলে বলেন, আর পেছুবার পথ নেই উকিল সাব। এখন শেষ পর্যন্ত এগুতেই হবে।

নরেশ উকিল চোখ তোলেন, আর তার ফসল কুড়াবে তোমরা!

শুধু আমরা কেন? আমাদের মধ্যে তুমি নও? যখন খতম-ওয়ালারা হুমকি দিয়েছিল, তখন কি আমাদের সঙ্গে তোমার নামটাও ছিলনা? তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে, ওই চীনওয়ালাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটাই তো তোমার ফরমূলা ছিল। নাকি? তবে আজ পিছুতে চাইলে হবে কেন?

—কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটা আর আদৌ গোপন থাকছে না।

দরকার নেই গোপন থাকার। তোমার ছেলে, আমার ছেলে, আরও যাদের যাদের আমরা এগিয়ে দিয়েছি তাদেরই বা ফেরাব কি বলে? ওদের কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারো? পারোনা। সুতরাং যে করেই হোক এবার সরকার আমাদের দখল করতে হবে। দিল্লীরও ইচ্ছে তাই। আর একবার যদি সরকার দখল হয় তো তখন দেখা যাবে। আমাদের সব সমস্যা সমাধান করে নিতে পারব। বুঝলেনা, ব্যাপারটা হলো গিয়ে এই রকম। কাজে কাজেই এখন আর ফেরার চিন্তা করোনা।

নরেশ উকিলের বলিরেখা চিন্তার ভারে বুঝি আরও গভীর হয়ে উঠলো। দয়াল শা চলে যেতেই রেণুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুই তো নামোপাড়ার দীপুকে দেখেছিস, দেখিস নি? কথাবার্তা একটু আদটু আছে তোর সঙ্গে?

রেণু চেনবার চেষ্টা করে বলে, আছে, ওই মুখচেনা আর কি।

মেয়েটি কিন্তু বেশ! সেদিন এসেছিল। যেন নদীর মতো গভীর, অথচ শান্ত!

প্রায় অন্ধকারের সমুদ্র সাঁতরেই পেছনের দেওয়াল টপকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে দিগেন। কতদিন দেখা নেই। মা, বাবা, দাদু, দীপু, শিবু—কে কেমন আছে, কে জানে? মনটা ভয়ানক ছটফট করছিল। ইচ্ছে করেই ঝুঁকি একটা নিল। যেভাবে কেউ তাড়া করে বেড়াচ্ছে কবে যে তুলবে ঠিক নেই, নয়তো এক গুলিতেই খতম।

খুট করে শব্দ হতেই দীপু বাতিটা উস্কে দেয়, কে?

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরে দীপুর হাতটা, বাড়াসনি, অন্ধকারই থাক। আমি দাদা!

দাদা! চমকে ওঠে দীপু। উঃ কত দিন পর এলি!

মা কই? বাবা, শিবু সবাই ভালো তো?

হ্যাঁ। সবাই শোবার ঘরে গল্প করছে। বাবা বাথরুমে।

দাদু!

ওইতো। খাটিয়াটার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় দীপু।

দিগেন এগিয়ে এসে এক হাঁটু ভেঙে দাদুর দিকে ঝুঁকে ডাকে, দাদু!

দাদু অনুভব করবার চেষ্টা করেন কে ডাকছে, গোঙাতে গোঙাতে জিজ্ঞেস করেন, কে দিগা?

—হ্যাঁ দাদু, আমি ! দু হাতে দাদুকে জড়িয়ে ধরে তুলে বসায়।

দাদু যেন বহুদিন বাদ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়েছেন, তেমনি আগ্রহে তার শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে দিগেনের মাথায় মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, এতদিন কোথা ছিলি ? মুখে এত খোঁচা খোঁচা দাড়ি কেন ?

দিগেন কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ এ ভাবে দাদুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। ততক্ষণে বাবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি সবই শুনতে পেয়েছিলেন ভেতর থেকে। দিগেনকে দেখে একবার মাত্র দাঁড়ালেন ওর সামনে। আবছা অন্ধকারেই চোখা-চোখি হল। বাবার চোখে খুশীর আভাস।

দীপু ততক্ষণে দিগেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

মাকে বললি ?

উহুঁ !

চল। কলেজে যেতে পারছিস এখন ?

উহুঁ। আমাদের পাড়ার কোন ছেলে না, কোন মেয়ে না। কেউ যেতে পারে না।

চারুবাবু শুধু বললেন, ভেতরে যা। তারপর নিজে গিয়ে দরজা এঁটে দিয়ে এলেন ভাল করে। তার আগে উঁকি মেরে দেখে নিলেন কেউ আশে পাশে আছে কিনা। বাড়ীর পেছনটাও দেখলেন।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল। দীপু দাদাকে বলে, উঃ, তুমি যখন লাফিয়ে পড়েছিলে কি ভয়টাই না পেয়ে গিছলাম দাদা। দেখ, বুকটা আমার কেমন ঢিপঢিপ করছে। তুমি এলে কেমন করে ?

বাইরে এতক্ষণ ফিসফিস কথা বলায় আলজিলা ঘুমটা ভেঙে যায় সুনন্দার।

বই থেকে চোখ তুলে কান সচেতন করে শিবু।

দিগেন শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, খুব ভয়ে ভয়ে আছিস তো ?

—ভয় মানে? একদিন রাত্তিরেও ঘুমুতে পারিনা। রোজ বোম পড়ছে। রোজ হামলা। একে মারছে, ওকে মারছে। কি যে অবস্থা সে তুমি বুঝবেনা দাদা।

দিগেন মনে মনে হেসে ওঠে, ঠিক বলেছিস। আমি আর কোথেকে বুঝব? সুকান্ত পল্লীর ঘটনা সব শুনেছিস? সেদিন ওখানে আমি ছিলাম।

যা! দীপু যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ওখানে থাকবে কেন? সে তো একেবারে যা তা!

সুনন্দা আর শিবু দুজনেই উঠে দাঁড়ায়, যেন ভূত দেখছে। সবাই নির্বাক হয়ে পড়ে। দিগেনের এক গাল দাড়ি দেখে তো সুনন্দা কেঁদেই ফেলেন, একি চেহারা করেছিস দিগু!

চেহারা? সে হবেখন। বাতিটা কমিয়ে দাও। শিবু তুই একবার বড়দাকে খবর দিয়ে আয়। ছুটে যা। আর কাউকে না। বড়দাকে কানে কানে বলবি। কোন বিপদ বুঝলে যেন খবর দেয়।

শিবু উঠেই দে ছুট। ওদের ঘর থেকে নেমেই রাজু মুদির দোকান। তখনও বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। কপাট বন্ধ হলেও একপাট খোলা। রাজু মুদির দোকান পেরিয়েই লম্বা একটা চাতাল। তারপর ঝুমুদের রেশন দোকান। রেশনের দোকানের পরেই সে ভূতুড়ে আম গাছটা। শিবু কিছুতেই ওই গাছটা পেরুতে পারেনা। সর্বদাই মনে হয় ওর তলা দিয়ে পেরুলেই ঠিক ওর ঘাড়ে চেপে ধরবে ভূতটা।

এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো শিবু, তারপরই যা হয় হোক ভাব নিয়ে দে দৌড়। বড়দার দোকান এবং বাড়ী তাকে যেতেই হবে। এখন যে জীবন মরণ সমস্যা। ভূত তো তুচ্ছ তার কাছে।

বড়দা শুনেই বলল, এইরে সেরেছে। কি দরকার ছিল আজই এলাকায় ঢোকার। ভীষণ স্পাইং হচ্ছে। তোদের বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টার ওয়াচ, গাধা। তারপর খচখচ করে সিগারেটের কাগজে

লিখল ব্যাপারটা। সতর্ক করে দিয়ে বলল এক মিনিটও দেরী নয়! পেয়েছে কি কেটে পড়বে। রাস্তা ডিঙ্গিয়ে ওপর পাড়া দিয়ে পালাবে। লোক থাকবে।

শিবু চিঠি নিয়ে রওনা দেয় আবার। এবার যে পথে এসেছে সে পথে নয়। স্কুলপাড়া হয়ে। ওটা বড়দার নির্দেশ।

সুনন্দা ততক্ষণে দিগেনের গা ঘেসে বসেছেন, এই রকম আর কত দিন চলবে বল দিকিনি? হ্যাঁরে, সুদীপ্তর কি খবর বল দিকিনি? কত দিন ছেলেটা এমুখো হয়না।

সুদীপ্তর কথা উঠতেই দিগেন গম্ভীর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দীপুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকায়। দীপুর চোখে কি উৎকণ্ঠার ছাপ? দীপু চোখ নামিয়ে নেয়। খবর পেতে তো চায়-ই। ওতে আর দোষের কি আছে?

দিগেন আমতা আমতা করে বলে, সুদীপ্ত বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছে। পর পর দুটো ঘটনা ঘটে গেল কিনা। মনের দিক থেকে সহ্য করতে পারছিলনা। তারপর বলা উচিত হবে কি হবেনা ভেবে নিয়ে, আড় চোখে দীপুর দিকে লক্ষ্য করে বলে, ও আমাদের কারো সঙ্গে কথা না বলে পালিয়েছে। অবশ্য পরে বিপিনদাকে একটা চিঠি দিয়ে সব জানিয়েছে।

দীপুর মুখ কালো হয়ে গেলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে। উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো। দিগেন বুঝতে পারলে দীপু ব্যাপারটায় প্রচণ্ড আঘাত পাবে। কারণ সুদীপ্ত সম্বন্ধে দীপুর অনেক উঁচু ধারণা।

চারুবাবু বলেন, আচ্ছা এতদিন বাদে ছেলেটা এলো, তা তোমরা কি কেবল গপ্পোই করবে নাকি? ওকে একটু খেতে টেতে দাও।

দিচ্ছি গো দিচ্ছি। কতদিন পরে এলো। একটু কথাবার্তা যদি হয়ই।

—বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছে মা। যে কোন সময় কিন্তু আমি চলে যেতে পারি। এত্তেলা এলেই হলো। আর শোন যার জন্যে

এসেছি আরও বেশী করে, দু'-একদিনের মধ্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। সম্ভবতঃ কোলকাতা। সেখানে বেশ কিছু দিন থাকতে হবে। চিঠিপত্র দিলে তো পাবে না। তোমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই রকে সেন্সার হবে। তোমরা বরঞ্চ মাঝে মাঝে অফিসে শিবুকে পাঠিয়ে খবর নিও, কেমন? হয়তো চিঠি লেখার সময় নাও পেতে পারি।

সুনন্দা ঘাড় নেড়ে সায় দেন, তাই হবে বাবা। চিঠিপত্র দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যেখানে থাকিস যেন ভাল থাকিস। নিরুদ্দেশের প্রতি সুনন্দা নমস্কার জানালেন হাত জোড় করে।

চারুবাবু যোগ করেন, তোর যে যাওয়ার পোগ্রাম আছে সেটা আমরা জানি।

জানো? চমকে ওঠে দিগেন, তারপর জিজ্ঞেস করে, কি করে?

—পরশু বোধ হয় বাণী এসেছিল। ওই বললে। ওতো প্রায়ই আসে। কিন্তু সব সময় দেখি ও নিজেও তোর খবর দিতে পারেনা।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

হ্যাঁরে, তোর চাকরীর কি খোঁজ খবর নিয়েছিলি আর?

না। তবে শেড কমিটি ঠিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য চাকরী আমি আর করবনা ওটা ঠিক হয়ে গেছে।

বাইরের নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ঘন মেঘে আরো অন্ধকার হয়ে এলো। এতক্ষণ দীপু বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। দিগেন তার কাছে উঠে এলো। নিঃশব্দে কাঁদছে ও। দিগেন আলতো ভাবে দীপুর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়, তোর এক্ষুণি কাঁদার কি হলো? ছেলেটা কি আদৌ আর আসবেনা নাকি? যদি ওর বলিষ্ঠতা থাকে, যদি আত্মপ্রত্যয় থাকে ও নিশ্চয় ফিরে আসবে। যদি না ফিরে আসে তবে তো বুঝতে হবে এক নম্বরের কাওয়ার্ড! আর সেই রকম একটা কাওয়ার্ডের জন্যে তুই কাঁদছিস? এই দেখ তোর কাঁদার

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকেও জল। এই দেখ। দিগেন হাতটা দিয়ে দীপুর হাতে জলটা মুছে দেয়।

প্রচণ্ড শব্দে আকাশ ডেকে উঠলো। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাল। শিবু প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এসেই দাদার হাতে বড়দার চিরকুটটা দেয়। বাবারে বাবা এক দৌড়ে ছুটে এসেছে।

দিগেন চিঠিটায় চোখ বোলানর সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ একদম অন্ধকার হয়ে গেল। মাকে ডেকে বললে, মা আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে!

ততক্ষণে সুনন্দা খাবার বেড়েছেন, ওখান থেকেই ডাকলেন, নে খেয়ে নে চাট্টী। তুই তো ছেলেবেলা থেকেই পুঁই-চিংড়ি ভাল বাসতি। পুঁই-চিংড়ি দিয়ে অল্প করে একটু ভাত খেয়ে নে।

কিন্তু মা?

উঁহু, তোদের কোন কিন্তু শুনব না। প্রচণ্ড ভাবে তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠেন। কথা না বলে এতক্ষণে বসলে তোর হয়ে যেত।

দিগেন আর কথা না বলে বসে পড়ে। সত্যিই বহুদিন মার হাতের রান্না খায়নি। তার উপর পুঁই-চিংড়ি। মনে উদ্বেগ থাকলেও চটপট ভাত ক'টা মেখে ফেললে। টপাটপ দু-তিন গরস মুখে দিয়ে ফেললে, আঃ, অদ্ভুত। কতদিন খাইনি!

কিন্তু ঠিক চতুর্থ কি পঞ্চম গরসটি যেই মুখে তুলতে যাবে, তীব্র পরিচিত শিষের শব্দে দিগেনের হাতের ভাত হাতেই থেকে যায়। মুখের হা-টা কোন রকমে বুজে এক লাফে উঠে পড়ে।

বাইরে তখন বর্ষণ শুরু হয়েছে।

অথচ তার অপেক্ষা করার সময় নেই একটি মিনিটও। সুনন্দা প্রায় আর্তকণ্ঠে ফুঁপিয়ে ওঠেন, ও ক'টা শেষ করে যা বাবা!

ম্লান হাসে দিগেন, মিছে বলছ মা, কোন উপায় নেই। হয়তো এর মধ্যেই দেরী হয়ে গেছে। আমি আসি।

এক মিনিটও অপেক্ষা করলো না। প্যাণ্টটাকে ইঞ্চি তিনেক

গুটিয়ে নিয়ে কারো দিকে লক্ষ্য না করেই পেছনের দিক দিয়ে যে ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই দেয়াল টপকালো।

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বরষা।

চারুবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আপসোস করে ওঠেন, এরি নাম বেঁচে থাকা।

চৌকাঠে থ হয়ে বসে রইলেন সুনন্দা। পেছনের জাফরি কাটা জানালা দিয়ে লক্ষ্য করে দীপু, অন্ধকারের মধ্যেও যদি দাদাকে দেখা যায়। শিবু কিছু বুঝে উঠতে না পেরে দাদুর সঙ্গে খাটিয়ায় গুটি-শুটি শুয়ে থাকে! চারু বাবু একটার পর একটা বিড়ি ধরান আর দু টানেই শেষ করে ফেলেন।

এমনি করেই হয়তো সারাটা রাত কেটে যেতো। কি দরকার ছিল এভাবে দেখা দেবার। এতদিন আসেনি সবাই তো মনকে প্রবোধ দিয়েছিল। হঠাৎ কেনই বা আসা আবার কেনই বা এ ভাবে ছুটে পালানো।

বাইরের টিপ টিপ বর্ষাও যেন তাদের সঙ্গে তাল রেখে বর্ষেই চলেছে ক্লান্তিহীন ভাবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে তাদের থাকতে হলো না। প্রচণ্ড দাপটে বাইরের দরজার ধাক্কায় সবাই সচকিত হয়ে ওঠে! কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর হেড়ে গলায় চেঁচাতে থাকে, দরজাটা না খুললে এখুনি ভেঙে ফেলা হবে।

কিছু ভাববার আগেই চারুবাবু এগিয়ে গেলেন। দরজার খিলটা উঠাতেই প্রায় হুড়মুড় করে সব ঢুকে পড়ল বাড়ীটার ভেতর। খুঁদে চক্ষু ইয়া লম্বা, মুখে বসন্তের অগুণতি গর্তভরা লোকটা সেকেণ্ড অফিসারকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়, হ্যাঁ স্যার এই ঘরটায় এক্ষুণি ছিল।

ওরা বাড়ীর কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না। নিজের মনেই টিপটিপ বর্ষার মধ্যেই এঘর ওঘর, ঘরের ছাদ, পায়খানা, বাথরুম সব ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু উঁহু, কোথাও নেই। তক্তার নিচে

হাঁড়ি কলসীর পেছনে ঝোলান পর্দা সামনা-সামনি যা পায়, হয় টেনে ছিঁড়ে ফেলে নয়তো এক এক লাথিতে এক একটা ভাঙে। নিরাশ হয় এক একবার আর সেকেণ্ড অফিসারটা বিড়বিড় করে ওঠে, অল ফলস।

শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু না পেয়ে দীপুর দিকে চোখ যেতেই হাঁকে, এই যে মেয়ে, শোন! এদিকে এসো।

আতঙ্কে আধমরা দীপু পায়ে পায়ে এগোয়। সেকেণ্ড অফিসারের কাছ থেকে হাত চার পাঁচ-দূরে থাকতেই অফিসার পুঙ্গব চিৎকার করে ওঠে, যা জিজ্ঞেস করি সত্যি কথা বলবে, নইলে রিজার্ভ ফোর্সগুলোর দিকে দেখিয়ে বলে, ওদের হাতে ছেড়ে দেব। বুঝেছ?

দীপু পাথরের মতো থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ে তার শীতের কাঁপুনি?

অফিসারটা টর্চের তীব্র আলোটা ওর মুখে ফেলে চিৎকার করে ওঠে, দিগেন এসেছিল?

দীপু কি জবাব দেবে ভাবছিল।

আবার ধমকে ওঠে সেকেণ্ড অফিসার, বলো, এসেছিল?

সুনন্দা কি ভেবে এগিয়ে এলেন, বলিষ্ঠ স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এসেছিল।

মাই গড্।

কোথায় গেছে?

জানিনে। এই মাত্র দেয়াল টপকে চলে গেছে। এবার আপনাদের যা খুশী করতে পারেন।

এক লাফে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে আসে অফিসারটা। টর্চের তীব্র আলোটা প্রায় সার্চ লাইটের মতো জ্বলে ওঠে। কোন কথা না বলে, তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে ওপরে ওঠার চিহ্নটা লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে. ইউ অল ফুলস্! ফলো ব্যাক সাইড। হারি আপ!

তাড়া খাওয়া শুয়ারের মতো একটার পিঠে আরেকটা লাফাবার ভঙ্গিতে ছুটে যায়।

অফিসারটা বাইরে বেরুতে বেরুতে চিৎকার করেন, সব এক দিকে নয়। দু ভাগে ভাগ হয়ে, ঘিরে ফেলো। একটা কাকপক্ষী যেন পেরুতে না পারে।

মুহূর্ত মাত্র। পুলিশের দলটা এগিয়ে যেতেই এত বৃষ্টিতেও ঢুকে পড়ে সবাই। যেন ওত পেতেই ছিল। চক্কোত্তি, অমূল্য ভটচাজ, ভটচাজ গিন্নী, বড়দা, তোতন, তারু, নেপাল। ঢুকেই চার দিক লক্ষ্য করে হাতাহাতি গোছাতে আরম্ভ করে।

আজকাল এগুলো সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে। কেউ আর এর জন্যে অনুশোচনা করে না। উপরন্তু কে কার সাহায্যে কতোটা এগিয়ে আসতে পারে তাই চেষ্টা করে।

নন্তু শুধু হেসে বলে, ঠিক সময়েই সিগন্যাল দিয়েছিলাম। শালার দিগাদাটা যদি আর একটু দেরী করতো, তা হলেই হয়েছিল মাইরী।

সবার উপর দৃষ্টি রেখে বড়দা জিজ্ঞেস করেন, অবনী না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সেটা সবাই জানে।

সেদিন প্রায় সারা রাত ধরে নামোপাড়া ওপরপাড়া তুল কালাম হলো। এবার আর একটি ঘরও ছাড়া হলো না। কিন্তু কর্পূরের মতো উড়ে গেল লোকটা! আশ্চর্য। এত করেও কোন পাত্তাই করতে পারলোনা অফিসারের দলটা।

আর দিগেন উপস্থিত বুদ্ধি বলেই যেন সেদিন রেহাই পেয়ে গেল। ওপর পাড়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টাই করলো না সে। ওদের বাড়ীর পেছনের রাস্তার ওপাশ দিয়ে শহরে চলে যাওয়া এক বুক গর্ত নর্দমাটায় টুক করে নেমে বসে পড়েছিল। জলের তোড়টা ক্রমেই বাড়ছে। আরেকটু বাড়লেই ভাসিয়ে দিয়েছিল দেহটা। একটা পাক খেয়ে প্রায় খড়ের মতোই ভাসানো দেহটা তার টেনে

নিয়ে গিয়েছিল নিরাপদ এলাকায়। জি.টি. রোডের ধারে এসে একটা খুঁটি ধরে যখন উঠে এসেছিল তখন তার সারা গায়ে অসহ্য পোকা কিলবিল করছে। পকেট থেকে গোটা তিন ব্যাঙ আর দুটো ল্যাঠা মাছ বেরিয়েছিল। এত কষ্টের পরও হেসে ফেলেছিল দিগেন নিজের অবস্থাটা দেখে নিজেই। ল্যাঠা মাছ আর ব্যাঙগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে হেসে উঠেছিল দিগেন, বেড়ে ব্রাদার বেড়ে। এবার সব সরে পড় দিকিনি। তোমাদের সঙ্গে অবশ্য সহাবস্থান করা যায়। নর্দমার পোকা হলেও বিশ্বাস করা যায় কিন্তু, ওই শালাদের উহুঁ, কখনো নয়।

সিদ্ধান্ত মতো আঞ্চলিক অফিসেই সভা ডাকা হলো। বিপিনদা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার বললেন, ইমিডিয়েট কোলকাতায় চেক আপের জন্যে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বিপিনদা অনড়। এ সময়ে এ অঞ্চল তিনি কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারবেন না! বিশেষ করে এই রকম একটা ঝড়ো পরিস্থিতি। তার চেয়ে তিনি দিন কয় আঞ্চলিক অফিস থেকে সরে থাকতে চাইলেন। কাছে-পিঠেই, যাতে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাটা কম হয়। কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনার প্রতি তিনি নজর রাখতে চান।

কারো পীড়াপীড়িই তিনি শুনতে চাইলেন না। অগত্যা তাই ব্যবস্থা হলো। ঠিক হলো বড়দার বাড়ীতে তিনি এখন কিছু দিন থাকবেন, আর রণজিৎ রোজ তাকে রিপোর্ট করে আসবে।

আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে শঙ্কর চৌধুরী সভায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাছাড়া আরও ঘোষণা রাখলেন, যতোই সন্ত্রাস অব্যাহত থাকুক এর মধ্যেই সম্মিলিত প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। সুদীপ্তর চলে যাওয়াটা নিয়েও আলোচনা হলো কিন্তু এক্ষুণি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না। ঠিক হলো প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে

সুকান্ত পল্লীর মতামত আগে জানা দরকার। তারপর আঞ্চলিক কমিটি এগুবে। এ ছাড়া আরও ঠিক হলো দিগেনকে বর্তমান অবস্থায় কোলকাতা পাঠান চলবেনা কারণ সামনে কনভেনশন। কনভেনশনের প্রস্তুতি যা সুদীপ্তর উপর ভার ছিল তা দিগেন আর শঙ্কর দুজনে মিলে চালাবে বিপিনদার সঙ্গে পরামর্শ করে। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক দপ্তরের কাজে প্রায় পূর্ণাঙ্গ ভাবেই লেগে যেতে হবে দিগেনকে।

বাণী সিংহকেও সাবধান করে দেওয়া হলো। কারণ মহিলাদের ডেপুটেশনের বিক্ষোভটা গত পরশু যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালনা করেছিল বাণী সিংহ।

ওটা ছিল সমস্ত মহকুমা মহিলা সমিতির কর্মসূচী। যেভাবে সাধারণ শ্রমিক মধ্যবিত্ত মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছিল তারই প্রতিবাদে নিজেরা উদ্যোগ নিয়েই এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল।

স্বভাবতই নেতৃস্থানীয় মহিলাদের মধ্যে অনেককেই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে বাণী সিংহকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ওকেই পুলিশ খুঁজছে বেশী করে। যে কোন দিন তুলতে পারে। এ নিয়ে জোর কানাঘুষা চলছে। বিশেষ করে মহিলাদের ডেপুটেশনের পর থেকেই অতিরিক্ত জেলা শাসক নাকি ভীষণ ক্ষেপে গেছেন।

কারণ এত অত্যাচার চালিয়েও এতটুকু দমান যায়নি এদের। বাণী সিংহ হপ্তাখানেক ধরে দিন রাত পরিশ্রম করে যে মিছিল সংগঠিত করেছিলো, শুধু মহকুমা কেন জেলার ইতিহাসে এক সঙ্গে এত মেয়ে এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। এর আগে ডি. এস. ঘেরাও এর সময়ও এত মেয়ে বেরিয়ে আসেনি।

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে সমস্ত কোর্টই অবরোধ করে রেখেছিল। অতিরিক্ত জেলা শাসক হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন ডেপুটেশনে মিট

করবেন না। অবরোধের চেহারা দেখে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে শেষ অবধি।

এমন কি তিনি কথা দিতে বাধ্য হয়েছেন কেরোসিন তেল, চাল আর চিনি যা কালো বাজারীদের দৌলতে শহর অঞ্চলে একদম নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে, দু দিনের মধ্যে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন হলে বিধিবদ্ধ দোকান মারফত সাধারণ মানুষ তা যাতে সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

তবে সন্ত্রাসের কথা যা বলা হয়েছে, ওতে তিনি একদম একগুঁয়েমি দেখালেন। তিনি পরিষ্কার জানালেন তেমন কিছুই হয়নি। বরঞ্চ সাতষট্টি কিংবা উনসত্তরের তুলনায় এখন অনেক ভাল। দু একটা যা কেস হচ্ছে, তার জন্যে গণতন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই দায়ী। সরকারের তাতে করণীয় কিছু নেই।

সেদিনের সভায় আরও আলোচনা হলো সম্মিলিত প্রতিরোধের সাফল্য নিয়ে। একদিকে বিভিন্ন সমাজ বিরোধী দল যেমন টুনু ঘোষ, সারাফত, ট্যারাকেষ্ট, দীনু সিং-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকা উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। প্রায়ই এলাকা ছাড়তে হচ্ছে শিক্ষক, যুবক, কেরাণী, মজদুরদের। ঠিক পাশাপাশি কসাই মহল্লা সুকান্তপল্লী, নামোপাড়া ওপরপাড়া, রাজপাড়া, বাউড়ী পাড়ায় প্রতিরোধের ফলে খুব একটা সংকট সৃষ্টি হয়নি। আঞ্চলিক সমিতি থেকে সেই সব পাড়া কমিটিগুলিকে অভিনন্দন জানানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হলো যে সমস্ত এলাকা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় আবার মানুষের মনে সাহস সঞ্চয় করে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল সেদিন আঞ্চলিক কমিটিতে। সভা শেষ হলো সন্ধ্যা গড়িয়ে।

বাণী সিংহ থাকে সব চেয়ে দূরে সেই নিউ টাউনে। ওর গাঙ্গুলী পাড়ায় একটা মহিলাদের মিটিং আছে। কিন্তু একা যেতে সাহস করছে না। অফিস থেকে বেরিয়ে লিচু গাছটার নিচে দিগেনকে ধরে ফেলে, এই যে মিস্ত্রী সাহেব, এখন তো আপনার স্বপ্ন সফল। আপনি তো এখন সব সময়ের কর্মী। আমার জন্যে কি একটু সময় দিতে পারবেন? অবশ্য টি-ইউর জীপটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু চালাতে পারে এমন কেউ নেই।

দিগেন ঠেসটা বুঝতে পারে, হেসে বলে—অচল দুয়ানী চালানই তো আমার কাজ, চলুন, দেখি চেষ্টা করে গাড়ীটা যদি আমার হাতে আবার ষ্টার্ট নেয়, তবে তো?

হাসতে হাসতে দুজনেই জীপটায় চেপে বসে। বাণী প্রথমে ভেবেছিল পেছনে বসবে। কিন্তু তা আর পারল না। দিগেনের পাশেই উঠে বসলো, পাশেই বসলাম কিন্তু, গোঁসা করবেন না।

দিগেন এবার চটে উঠে, হচ্ছেটা কি? কী এমন ব্যাপার হলো সেই থেকে তুমি ছেড়ে আপনি শুরু করেছ? এত রাগের হলো কী?

বাণী এবার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে—না, হবে আবার কি? তোমার এখন প্রমোশন হয়েছে। তাই ভাবছি আগের মতো কথা বললে যদি চটে যাও।

বুঝেছি। তোমার আসল রাগটা কোথায় বুঝেছি। কিন্তু তুমি কি মনে করো তোমাকে যে কথা দিয়েছি এক্ষুণি সেটা রাখার সময় এসে গেছে। কিংবা সময়টা ফুরিয়ে গেছে?

বাণী এবার মাথা নুইয়ে নেয়।—তোমরা সব মেয়েরা বুঝেছো নিজেদের ব্যাপারটা একটু বেশী ভাবো, আর আগে আগে ভাবো।

বাণী নড়ে ওঠে, ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম আমার! কিন্তু সব মেয়েদের ওই ভাবে জড়ানো কেন আবার?

দিগেন বোঝে রাগের মাথায় সব মেয়েদেরই আক্রমণ করে বসেছে। সেও চুপ করে থাকে কোন উত্তর না দিয়ে।

বাণীই বলে, সময় তো রয়েছেই একটু লোকো ট্যাঙ্ক হয়ে যাবে? অনেক দিন বসিনি ওখানে! সেই কবে সাতষট্টির গোড়ার দিকে নির্বাচনে জেতার পর দুজন সারা রাতই গল্প করে কাটিয়ে দিয়ে ছিলাম এখানে, মনে আছে তোমার?

দিগেনের বুঝি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, সে দিন বোধ হয় আর ফিরে আসবে না।—কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও বসাটা কি নিরাপদ কমরেড?

কমরেড! এই প্রথম নতুন সম্বোধন দিগেনের মুখে। এর আগে বাণীকে আর কোন দিনও কমরেড সম্বোধন করেনি। হয় সিংহ মশাই, নয় ভদ্রমহিলা, কিংবা এই যে মহিলা পাণ্ডা ইত্যাদি ভাষায় ডাকতো। অনেক দিন সভার মধ্যেও এই রকম বলে ফেলে অন্যের কাছে ভৎর্সনা পেয়েছে কিন্তু অভ্যাসটা পালটাতে পারেনি। অথচ আজ হটাৎই কমরেড সম্বোধন।

বাণী সিংহ চোখ তুলে তাকায়, কি ব্যাপার আজ একেবারে নতুন ভাষা?

দিগেন বলে, কি হলো? ভুল করেছি?

—না ভুলের কথা নয়। তবু তো তোমার মুখে সম্পূর্ণ নতুন। তাই চমকে উঠেছিলাম।

দিগেন গাড়ীটার ব্র্যাকটা কষে। আবছা আলোয় লোকো ট্যাঙ্কের বিখ্যাত সেই কয়েদবেল গাছটার তলায় প্রশস্ত হাতটা বাড়িয়ে বাণীর হাতটা টেনে নিয়ে বলে, আমি তোমার খবর পেয়ে গেছি বাণু। বিপিনদা আমায় সব বলেছেন। এবং তুমিও যে সব সময়ের কর্মী হিসেবে যোগ দিতে রাজী হয়েছ তার জন্যে তোমাকে আমার পক্ষ থেকে হাজারো লাল সেলাম।

বাণী অভিভূত হয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। এতদিন পর সত্যিই তাহলে দিগেনের কাছে সম্মতি পেল। কোন কথা না বলে

দিগেনের হাতে হাত রেখে বসে রইল। এত সুখের মুহূর্ত বোধ হয় জীবনে আর কোন দিন আসেনি। এমন কি প্রথম জীবনের বাসর দিনের অনুভূতির চেয়েও অনেক বেশী মধুর মনে হলো এই ক্ষণটুকু। বাণী সিংহ আর দিগেন দুজনেই আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে বসল।

সে রাতে সভা করে কেউই আর নিজেদের ডেরায় ফিরল না। আঞ্চলিক অফিসের হল ঘরটায় কাটিয়ে দিল কমিউনের বাকী কমরেডদের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমরেডই সেদিন আর ঘুমাতে পারলো না কারণ শুয়ে শুয়ে দিগেন সেদিন কি ভাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে ওই জল ঝড়ের মধ্যে পুলিশগুলিকেও ফাঁকি দিয়ে নিরাপদেই পৌঁছে ছিল সেই কাহিনী শোনাল।

এই প্রথম সবাই জানতে পারলো শহরের বড় নালাটার মধ্যে জলের তোড়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে কি ভাবে পুলিশ দলটার চোখে ধুলো দিয়েছিল দিগেন সেই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কথা।

একদিন এই নামোপাড়ার প্রতিঘরে আনন্দ ছিল, সুখ ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। জীবন উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্য ছিল। একের প্রয়োজনে প্রতিবেশীরা নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অভাব, অভিযোগে একে অপরের সাহায্য পেত। ইদানিং সেই জীবন প্রবাহে ঘোর দুর্দিন নেমে এসেছে। দিনে দিনেই সে অবস্থা বুঝি আরো অবনতির দিকে ছুটে চলেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। পাশের মানুষটিকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। শুধু মাত্র বড়দা এখনও সংগঠনকে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছেন। তোতন, নন্তু মিসায় আটক। নেপালদের প্রায় সকলেই উঠে গেছে রেলপার। সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। অমূল্য ভটচাজের ছেলেটা পাইপগানের গুলিতে নিহত। নামোপাড়ার সমস্ত অঞ্চল জুড়েই নেমে এসেছে এক নিস্তব্ধ শোকের রাজত্ব।

চারু বাবুর সংসারেও অভাব ছিল কিন্তু আনন্দের অভাব ছিল না। হৈচৈ করে সকলকে নিয়ে দিন কাটাতে তিনি ভালবাসতেন। স্বভাব রসবোধ তাঁর ছিল। তার ওপর কিছুদিনের ফৌজী সান্নিধ্য তাতে মদত জুগিয়েছিল।

কিন্তু সেই সোনার সংসারে আজ রাহুর থাবা। গ্রেপ্তারের আকস্মিকতা তাঁকে যেন অন্য মানুষ করে দিয়েছে। বড় ছেলে দিগেন ঘরে ফিরতে পারছে না। চাকরী তো কবেই গেছে। মেয়ের কলেজ, ছেলের স্কুল সব বন্ধ। চারুবাবু কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। হাসতে হয় জোর করে হাসেন, কথা বলতে হয় বলেন, খেতে হয় খান। কাজে যেতে হয় কাজ করেন কিন্তু তাতে কোন উদ্যোগ নেই।

বিকেলের দিকে কাজ থেকে ফিরে দাওয়ার অল্প পরিসরের মধ্যে উবু হয়ে বসে নখ খুঁটছিলেন। সুনন্দা জল খাবার তৈরী নিয়ে ব্যস্ত। তিনিও কেমন যেন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছেন। শিবু ফেরেনি এখনও। আনন্দ বাবু খাটিয়ায় বাংলা দ'এর মতো পড়ে গোঙাচ্ছেন। ওঁর এই রকম শব্দটা আর এদের কাউকে উদ্বিগ্ন করে তোলে না।

দরজার কাছে একটা মুখ দেখা দিতেই গলা বাড়িয়ে দেখলেন চারুবাবু। ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না! দীপুকে ডেকে বললেন, দেখতো মা বাইরে একটু।

দীপু আঁচলটা অবহেলাভরে বাঁ কাঁধে ছুড়ে দরজার দিকে এগোয়। দরজায় নরেশ উকিল। হতভম্ব হয়ে পড়ে দীপু। বিস্ময়কর অবস্থাটা কেটে যেতেই নিরুৎসাহ নিয়ে ডাকে—দেখ বাবা কে এসেছেন। আসুন, ভেতরে আসুন।

চারু ততক্ষণে উঠে এসেছেন। নরেশবাবু চারুবাবুকে দেখেই মৃদু হেসে হাতের লাঠিটা অভ্যাস বশে একটু উপরে তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথাটা নিচের দিকে একটু চাপ দেন।

চারুবাবুর মুখে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। দু হাত তুলে সাধারণ ভাবে নমস্কার করে বলেন, আসুন। তারপর সুনন্দাকে লক্ষ্য করে হাঁকলেন, ওগো নরেশবাবু এসেছেন।

নরেশবাবুর আসাটা সত্যিই অচিন্তনীয় এদের কাছে। দীপু চেয়ারটা মেঝের ওপর পাততে পাততে বলে, রেণুদিকে নিয়ে আসেন নি? এখানেই বসুন। ভেতরে ভীষণ গরম।

দীপু নিজের আঁচলটা দিয়ে চেয়ারটা মুছে দেয়।

নরেশবাবু হেসে বলেন, রেণুর তো বাড়ী ছেড়ে বেরুন মুসকিল। ভাইটা অসুস্থ, ওকেই তো দেখাশোনা করতে হয়। ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম আসব আসব। কিন্তু নানান কাজে আর হয়ে ওঠেনি। আপনার মেয়ে সেদিন আমার ওখানে গিয়েছিল, ভারী চমৎকার মেয়ে। কি নামটা যেন, এই দেখো, একদম ভুলে গেছি। মাথা চুলকাতে চুলকাতে মনে করার চেষ্টা করে ভারী-র ওপর জোর দিয়ে আরেকবার বলেন ভারী চমৎকার।

দীপু ম্লান হাসে। মাথা নিচু করে মনে পড়িয়ে দেয়, দীপু।

হ্যাঁ দীপু। নামটাও সুন্দর। দু অক্ষরের নামগুলো আমার খুব পছন্দ। আমার ছেলে-মেয়েদের নাম ও অই রকম দু অক্ষরে, রেণু, টুনু।

চারুবাবু সুনন্দাকে আবার হাঁকেন, একটু চা করে ফেল না চটপট।

দ্রুত বাধা দেন নরেশ বাবু, উহুঁ, চা'র জন্যে ব্যস্ত হবেন না। কিসসু না। চা আমি অনেক দিন ছেড়েছি। এই যে দেখছেন চুরুট, এই চুরুট ছাড়া প্রায় সবই আমি ছেড়েছি। শুধু করবেন তো আধ গ্লাস সরবৎ তাও চিনি খুব কম দেবেন, এই একটু। হাত দিয়ে প্রায় আধ চামচের মতো পরিমানটাও তিনি নির্দেশ করে দিলেন।

সুনন্দা রান্নাঘরের চৌকাঠে ভর দিয়ে মাপটা দেখে নিলেন।

চারুবাবু দাওয়ার উপর খালি মেঝেতে বসলেন, সুনন্দার দিকে তাকিয়ে যেন রসিকতা করছেন সেই ভাবে বললেন, যাক তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। চিনির যা দাম বেড়েছে, বেশী চিনি দিয়ে সরবৎ করতে হলে তুমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসতে।

সুনন্দা ঘোমটার আড়াল থেকে বলে ওঠে, আহাহা কথার ছিরি দেখোনা! সকলের সামনেই যা খুশী বললেই হলো আর কি!

নরেশবাবু মৃদু হাসেন, বলেন—হ্যাঁ, বলেছেন অবশ্য ঠিকই। সরকার হঠাৎ কেন যে ডিকণ্ট্রোল করতে গেল বুঝি না। নির্বাচনের আগে না করলেই হতো। দামটা হঠাৎই যেন বেড়ে গেছে। আচ্ছা, এটা তো আপনাদের নিজেরই বাড়ী, না ভাড়া?

নরেশবাবু শেষ করার আগে চারুবাবু উত্তর দেন না, নিজের বাড়ী আর কোথা থেকে হবে বলুন? তেতাল্লিশ টাকা করে দিতে হয়। তাও জল বাইরে।

হুঁ, ঘাড় নাড়েন নরেশবাবু, মার্কেট অনুযায়ী একটু বেশীই বটে। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ চারধারটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। অভিজ্ঞ দৃষ্টি। বুলিয়ে নিয়ে, হাতের লাঠিটার মাথায় চাপ দিয়ে বলেন, খুব সস্তায়ই সেরেছেন। আজকাল অবশ্য খরচ করে বাড়ী করাও অসুবিধে। দিল্লী তো দেখছি নিত্য নতুন আইন পাস করছে। শুনছি শহরের সম্পত্তি টম্পত্তির সব সিলিং এঁটে দেবে। দু-চার পয়সা যাদের আছে, সত্যি বিপদ!

চারুবাবু কোন সায় দিতে পারলেন না। উপরন্তু মনে মনে ভাবলেন ব্যাপার খানা কি তাই নাকি! আইন তো করেন অনেক কিছুই, সে তো মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। কাজে লাগান ক'টা? লাগাতে গেলে তো নিজের ঘরেই আগুন লাগবে।

দীপু কাচের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে আসে। নরেশবাবু এক চুমুক খেয়েই তারিফ করেন, বেশ হয়েছে। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ।

সুনন্দা চা দিয়ে গিয়েছিল স্বামীর সামনে। চারুবাবু তাতে

চুমুক দেন। মৃদু হেসে বলেন, আপনার সরবৎটা নিশ্চয় আমার মা-মণি করেছে! ও আমার লক্ষ্মী মা।

নরেশবাবুও হাসেন, আমার বাড়ীতেও আমার যা দেখাশোনা সব করে আমার মেয়ে রেণু। ও না থাকলে এক মিনিটও আমার চলতো না। ছেলেটা আমার একটু বেশী চঞ্চল। ওকে জব্দ করতে পারে এমন একটি মেয়ে বহুদিন খুঁজছি। বুঝলেন কিনা, এ ছাড়া আমার আর কোন দুঃখ নেই। আপনার মেয়েটি সত্যি ভাল। রেণুর ব্যবস্থাও আমি করে ফেলেছি। ছেলেটির ব্যবসাপত্তর আছে। পাস করাও বটে। কিন্তু আমার ইচ্ছা কি জানেন, একই সঙ্গে সেরে দেওয়া। একজন যাবে, একজন আসবে।

যেন বহুদিনের ঘনিষ্ঠ, ঠিক সেই ভাবেই কথাবার্তা বলতে থাকেন নরেশবাবু। কিন্তু চারুবাবু কিংবা সুনন্দা, কিংবা দীপু বুঝে উঠতে পারে না নরেশবাবু হঠাৎ এলেনই বা কেন, আর এত ঘনিষ্ঠ কথাবার্তাই বা কেন? আর নরেশবাবু এমন ভাবে প্রসঙ্গবিহীন সব কথাবার্তা বলছেন যাতে শ্রোতা ছাড়া তাদের আর কোন রূপ অংশ নেওয়া হচ্ছে না। শুধু একটা জিনিস ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, নরেশবাবু সম্বন্ধে যে যতই বলুক তিনি লোক তত খারাপ নন। হতে পারে পয়সা তার আছে, কিন্তু সে তুলনায় দেমাক তার নেই।

একটু থেমে চারুবাবুকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আমার চিন্তাটা কেমন?

—এতো সত্যিই সুন্দর। আপনাদের মতো লোক বলেই ভাবতে পারেন। আগু পিছু ভেবে নিয়ে কাজ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের আর কি তার কোন উপায় আছে। যখন যা হলো তাই করো। পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজই সুষ্ঠু ভাবে শেষ করা যায় না। আমরা পরিকল্পনা করব কি? দিন চালানোর সমস্যা নিয়েই সব সময়টা ফুরিয়ে যায়।

নরেশ উকিল, আসলে কি একটা কথা বলব বলব করেও

বলতে পারছেন না। তাই এ প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ নিয়ে টানাটুনি করছেন কেবল। দীপু এর মধ্যে উঠে গিয়ে হ্যারিকেনটা জ্বেলে দাওয়ার উপর রেখে গেল। একটা বই দিয়ে দাদুর দিকে আলোটা আড়াল করে দিল যাতে চোখে না লাগে।

দাদু একবার পাশ ফিরে গোঙাতে গোঙাতে জিজ্ঞেস করে নিজের মনেই, কে দিগা এলি ?

উত্তরের কোন প্রত্যাশা না করেই তিনি আবার গোঙাতে থাকেন। নরেশ বাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলেন চারু বাবু, আমার বাবা, রানিং নাইনটি। আমার বড় ছেলের নাম করছে। খুবই আদরের তো! অনেক দিন ধরে ঘরে আসতে পারছে না। শেষের দিকে বলতে বলতে নিজের অলক্ষ্যেই দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে।

নরেশবাবু সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, দিগেন তো আপনার বড় ছেলে ?

—হ্যাঁ।

—কোন খোঁজই পাচ্ছেন না-না ?

—না খোঁজ খবর আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে পারছে না। ভাবছি বাড়ীটা পাল্টাব কিনা ?

নরেশবাবু সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, সত্যিই বিপদ। সাতষট্টি থেকে সেই যে শুরু হয়েছে, কবে যে এর শেষ হবে কে জানে ? নো, ছাটস নট দা রুল্ অব ল'। এ ওর জমি দখল করল, ও তার জমি। এরা ওকে ঘেরাও করলো তো ওরা ওকে মারল। হোয়াট্স দিস। এটাই যদি আইনের শাসন, ত অরাজকতা কাকে বলে ? আপনি কি বলেন ? থাবান সাহেব কি যে জ্যোতি বসুকে সারটিফিকেট দিলেন, কিসসু বুঝি না। এণ্ড ছেন আফটার, দিস বিগ বগোয়াস্ ডায়াস, অল ফলস।

বলতে বলতে একটু যেন উত্তেজিতই মনে হলো নরেশবাবুকে।

একটু দম নিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, সেই যে শুরু এখনও পর্যন্ত তার জের চলছে। অবশ্য এটা হতে বাধ্য, সন্ত্রাস যদি একবার আমদানী হয়, তার পালটা ফল ফলতে শুরু করবেই। অনেক সময় অনেক নির্দোষ ভালো ভালো ছেলেরা পর্যন্ত এতে জড়িয়ে পড়ছে।

চারুবাবু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলেন। কিন্তু এখন কেমন যেন একমত হতে পারছিলেন না। অথচ নতুন বাড়ীতে এসেছেন তেমন ভাবে প্রতিবাদ করতেও মন সায় দিচ্ছে না। অন্য কেউ হলে তিনিও জবাব দিতে পারতেন। ঘটনাটা এত সরল নয়। এর সঙ্গে আরও কিছু ব্যাপার আছে, সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ রয়েছে এতদিন ধরে এক পক্ষের শোষণ করে আসার নির্লজ্জ ইতিহাস।

নরেশবাবুর মুখের উপর তা তিনি বললেন না। অতি বিনয়ের সঙ্গে শুধু বললেন, এখন যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি চলছে। রোজই, মার দাঙ্গা লুট, ছিনতাই।

নরেশবাবু সামলে নেন। তিনি উকিল মানুষ, সুর শুনলেই বাকীটা বুঝতে পারেন। তাছাড়া কোথায় দাঁড়িয়ে বলছেন সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, হ্যাঁ—এটাও সাপোর্ট করা যায় না। আবার তো একদল নির্বাচন নির্বাচন করছে। বুঝছেন না, কি হবে বারো হাঁড়ি এক করার চেষ্টা করে ? দে উইল কোয়ার্ল। একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করবে। আসলে চাই শক্ত হাত। শক্ত হাতে আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করুণার কোন প্রশ্নই নেই। নো কোশ্চেন এট অল, নো কোশ্চেন অব মার্সি।

চারুবাবু মাথা চুলকান। নরেশবাবু তো আরো শক্ত হাত চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে শক্ত হাতের ঠেলায় তো সাধারণের পরাণ যায়। মাথা নীচু করেই বলে, আইনের কথা আর বলবেন না, ওটার গয়াপ্রাপ্তি হয়েছে। সুকান্ত পল্লীর ব্যাপারটাতো শুনেছেন। বলুন না, এমন কি ব্যাপার ঘটে গেল যে ওখানে অমন

কুরুক্ষেত্র বানাতে হলো। আমাদের নামোপাড়াতে দেখ না দেখ পুলিশ চড়াও হচ্ছেই।

নরেশবাবু প্রসঙ্গটা টেনে মনে হলো একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। অথচ ঘটনার সঙ্গে তাঁর নিজের সন্তানও জড়িত। কিন্তু তিনি আসলে যে জন্যে এসেছিলেন, এখন সে বিষয়ে কোন কথা বলা আদৌ সঠিক হবে না বলে মনে করলেন। উঠবার জন্যে ব্যস্ত হলেন, বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, হিসেবে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এত অমিল, বুঝলেন এর আগে আমার আর কখনও হয়নি। মনে হচ্ছে সর্বত্রই বুঝি একটা ভুল হয়ে চলেছে। আর সবাই আমরা সেই ভুলের মাশুল গুণছি। উই আর অল ভিকটিম্‌স অব দিস এরা।

চারুবাবু হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠেন, ঠিকই বলেছেন ভুলের মাশুল আমরা গুণছি। কিন্তু ভুলটা কার? কার ভুলের মাশুল আমরা গুণছি? বলতে পারেন কোন অপরাধে আমার ছেলেটা এ-পাড়া ও-পাড়া করে বেড়াচ্ছে? সেদিন খেতে বসেছে, পাত থেকে উঠে যেতে হলো ছেলেটাকে। বুড়ো দাদু নাতি নাতি করে চিৎকার করে, কোন জবাব দিতে পারি না। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারি না! কি, কি আমাদের অপরাধ?

বলতে বলতে শেষের দিকে উত্তেজনা, ক্ষোভে চারুবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। দগ্ধ চোখে তিনি উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরিবেশটা যেন কি হতে কি হয়ে যায়। নরেশবাবু ঠিক এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। পরিবেশের প্রভাবে তাঁর মনও ভারাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আজ চলি চারুবাবু। আরেক দিন আসব।

চারুবাবু কোন জবাব দিতে পারলেন না।

দীপুই সাহস করে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেন এসেছিলেন কিছুই তো বললেন না।

—সে আর একদিন আসা যাবে মা। রেণুকে নিয়েই না হয় আসব। তুমি যেয়োনা আমাদের বাড়ী। চারুবাবু আসুন একদিন বেড়িয়ে যাবেন।

চারুবাবু কোন রকমে মাথা নাড়েন, আচ্ছা যাব। দীপুকে নিয়েই যাব।

নরেশবাবু সুনন্দাকে লক্ষ্য করে ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনিও যাবেন। আজ তা হলে উঠি।

—আচ্ছা।

এরপর নরেশবাবু শ্লথগতিতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। গুটি গুটি এগিয়ে যান বাঁ ধারের কাঁচা সড়কটা ধরে।

তিনি চলে যেতেই চক্কোত্তি বাইরে থেকে হাঁকে চারু,—ভেতরে আছ ?

—হ্যাঁ, এসো।

চক্কোত্তি ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে, নরেশ উকিল এসেছিল মনে হলো ?

—হ্যাঁ।

কি ব্যাপার ? কি উদ্দেশ্যে আবার আমাদের পাড়ায় ? ছেলে তো একটা পয়মাল তৈরী করেছে।

সুনন্দা বেরিয়ে এসে দাওয়ায় বসে, কি জানি, কি উদ্দেশ্য। বড় লোকের ব্যাপার ! এটা বলে, ওটা বলে, তারপর আরেক দিন আসব বলে গা তুললেন। কেন যে এসেছিলেন কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

চক্কোত্তী সন্দেহ প্রকাশ করে, দেখো দিগেনের খোঁজ খবর নিতেই কিনা ? কথাবার্তা বলতে বুঝে সুঝে বলবে।

চারুবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন সে আর আমাকে বলতে হবে কেন ?

—তাতো বটেই। তবু সাবধানের মার নেই বুঝলে না। আমরা

এখন একটু বেকায়দায় পড়ে গেছি কিনা তাই সব সময় সতর্ক হয়ে থাকা। অবশ্য চিরটা কালই আর এমন যাচ্ছে না। আচ্ছা আমি উঠি বৌঠান। সব আমতলে বসে আছে। আমি শুধু ব্যাপারটা জেনে গেলাম।

—একটু চা খাবেন না সুনন্দা জিজ্ঞেস করেন।

—না। একটু আগে খেয়েছি। আচ্ছা, আমি যাই। পরনের লুঙিটা অর্দ্ধেক ভাঁজ করে গুটিয়ে নেয়। আধ ময়লা গেঞ্জিটার ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে।

আসলে কোমরে যে বস্তুটা আছে সেটাকে আড়াল করা। রাতের বেলা ছ'ঘরার পিস্তলটা সঙ্গেই থাকে চক্কোত্তীর।

সুদীপ্ত উদভ্রান্তের মতো মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালো। নিজেও বুঝতে পারেনি কখন হাতের লোহার রড্‌টা অত উপরে উঠে গিয়েছিল এবং কত জোরে এসেই না সামনের গুণ্ডাটার মাথায় কেটে বসে গিয়েছিল। একবারই মাত্র শব্দ করতে পেরেছিল লোকটা। তারপর সটান সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সুদীপ্ত। বিকাশ হ্যাঁচকা টানে ধমকে ওঠে, এটা হচ্ছে কি সুদীপ্ত ? পালা !

সুদীপ্ত সংবিত ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু কেমন উন্মনা হয়ে পড়ল। এত দিনের জঙ্গী কর্মী, পরীক্ষিত কমরেড সুদীপ্ত ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কেন এমন হলো বুঝতেই পারলে না। নিজে কোন দিনই ভাবতে পারেনি তার এই হাত দুটো একটা জীবনকে এভাবে শেষ করে দিতে পারবে ! অথচ পারলো। ওর এই হাত দুটোই নিজের অজান্তেই যেন কাজটা করে বসেছিল। এছাড়া উপায় ছিল কি ? দিগেনের দিকে পিস্তলটা তুলে যে ভাবে তাক করেছিল এক সেকেণ্ডের ভুলের ফলে সারা জীবন তাকে মাশুল গুণতে হতো।

চমকে উঠেছিল দিগেন, সুদীপ্তকে লক্ষ্য করে বাহবা দিল, সাবাস! ব্যাপারটা বোঝার পরই!

কিন্তু সুদীপ্ত পালিয়ে এল। একদিন থাকার সাহসও তার হলো না।

বাঁকুড়া যে হোম থেকে এক দিন মানুষ হয়েছিল। অনেকটা অবচেতন ভাবেই বুঝি সেই বৃদ্ধ অধ্যক্ষের কাছে এসে হাজির। দুদিনেই সুদীপ্ত কেমন যেন কালসিটে মেরে গেছে।

ফাদার প্রথমে চিনতেই পারেন নি। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে চিনতে পারলেন, সুদীপ্ত না? চেহারাটা একি বানিয়েছ? এস, এস।

সুদীপ্ত সম্মোহিতের মতো বলে, আমি কিছু দিন এখানে থাকতে চাই ফাদার। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন? আপনার যদি কোন অসুবিধে না হয়তো........তা হলে আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন।

ফাদার প্রসন্ন ভাবে হাসলেন। সুদীপ্তের কাঁধে হাত রেখে বলেন, তুমি মনে হচ্ছে কোন রকম বিপদে পড়েছ। কথাবার্তা, চাল চলনে কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলছ! ঘটনা যাই হোক। তুমি এসো। যতোদিন খুশী, এ হোম তোমার জন্যে খোলা সুদীপ্ত!

সুদীপ্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মনটা কিছুটা হালকা হয়! সে এটা জানতো আর যে যাই করুক, ফাদার ব্রজমোহন তাকে কোনদিন দূরে ঠেলে ফেলতে পারবেন না।

বিকেলের দিকে সুদীপ্ত বিপিনদাকে একটা চিঠি দিল কিন্তু তার নিজের ঠিকানাটা সেই সঙ্গে সযত্নে এড়িয়ে গেল।

দীপু বেশ ক'দিন ধরে মনে মনে ভাবছিল সুদীপ্তর কথা। প্রায় এক মাস হয়ে গেল কিন্তু কেউ কোন খবরই দিতে পারছিল না।

সুকান্ত পল্লীর মেস বাড়ীটা পুলিশ তালা বন্ধ করে রেখেছে। পুলকদা নিমাইদা পাশেই আরেকটা বাড়ীতে উঠে গেছে। সুকান্ত পল্লীর ইউনিট অফিসেও খোঁজ নিয়েছে কয়েক বার। কিন্তু কেউ কিছু জানে না।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছে সেখানেও হাজিরা নেই। সহকর্মীদের কেউ হদিস দিতে পারলে না।

দীপু ভেতরে ভেতরে কেমন যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। জলজ্যান্ত লোকটার হলো কি? তবে কি? না, এ কিছুতেই হতে পারে না। অলুক্ষণে চিন্তাটা প্রায় জোর করেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। সুদীপ্তদার যদি কোন কিছু হতো তা হলে এতক্ষণে সারা শহর তোলপাড় হয়ে যেত।

মনটা ক্রমেই দমে এল দীপুর। নির্জন বাস রোড ধরে একা একা ধীর পদক্ষেপে বাড়ী ফেরার পথে প্রায়ই নিজের অজান্তেই চোখে অবাধ্য জল এসে যায়। কোন রকমে ঠোঁট চেপে কখনো সেই উদ্গত অশ্রুকে বাধতে চায়, কখনও বা কেঁদে কেঁদে হালকা করে ফেলে মনটাকে। দীপু আজ বুঝতে পারে, এতদিন কী ভুলই না করেছে! সুদীপ্তকে দেখলে, তার সঙ্গ পেলে দীপুর ভালো লাগতো। কিন্তু তা যে এত গভীর তা কিছুতেই বুঝতে পারেনি এর আগে। আজ মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে সুদীপ্তকে সে সত্যই ভালবাসে এবং তা অত্যন্ত গভীর। এমনি করেই অজানা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তার দিনগুলি গড়িয়ে যেতে থাকে। হয়তো এভাবেই চলে যেত।

কিন্তু আকস্মিক ভাবেই দাদার কাছে সুদীপ্তর খোঁজ পেয়ে কি ভালই না লাগছিল। সুখের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, অথচ তা যে এতক্ষণ স্থায়ী হবে বুঝতে পারেনি। সুদীপ্তর ওই ভাবে পালিয়ে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ও। বিমর্ষ হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। ডুকরে কেঁদে ওঠে

জ্বালাভরা আপসোসে, শেষ অবধি সুদীপ্তদা পালিয়ে গেলেন কেন ?

সুকান্ত পল্লী ইউনিট ঘটনাকে সহজ ভাবে নিতে পারলো না। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে সুদীপ্তের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতেও মনের দিক থেকে তেমন সায় পাচ্ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘ মাসাধিক কাল অবধি ওর অনুপস্থিতিটাকে কাজে লাগালো কিংশুক নিরঞ্জনের দল, তারা স্পষ্টাস্পষ্টি বাইরে বাইরে এই অপপ্রচার চালাতে আরম্ভ করে দিলে যে, সুদীপ্ত সাধারণ সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও কাঠগোলা ইউনিয়নের ব্যাপারে কিছুতো করেইনি উপরন্তু মালিকদের সঙ্গে সাট করে পালিয়েছে।

প্রথমে সকলেই ব্যাপারটা আগলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে প্রচারটাকে নিয়ে গেল ওরা, যাতে করে কিছু কিছু মজদুর ভাইদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল।

স্বভাবতই ইউনিটকে চিন্তা করতে হলো। নজীরটা খারাপ এ ব্যাপারে তো সকলেই নিঃসন্দেহ। বিকাশ আর সুখেন্দু কেমন যেন গুলিয়ে ফেললে। ক্রমেই ওরা একটু বেশী বলাবলি সুরু করলো।

সুখেন্দু পুলককে ডেকে বললে, এটা নিয়ে আমরা না হয় ভাবছি না। কিন্তু আঞ্চলিক কমিটির তো চিন্তা করা দরকার। নয়তো মুখ দেখানই দায় হয়ে গেল।

পুলক চোখ পাকিয়ে একটু রুক্ষ স্বরেই জবাব দেয়, আঞ্চলিক কমিটি কি করবে ? বিষয়টাতো আমাদের, না কি ? তা ছাড়া আঞ্চলিক কমিটি এ ব্যাপারে আমাদের বসতে বলে দিয়েছে। তুই হয়তো খবর পাসনি। পেয়ে যাবি। বোধ হয় আসছে শনিবার ইউনিট ডাকা হয়েছে।

সুখেন্দু জবাব দিল, ওপরের কেউ থাকবেন ?

নিশ্চয়। দিগেনদা আর বিপিনদা সুস্থ থাকলে বিপিনদা নয়তো শঙ্করদা।

বেশ ওখানেই বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, সুখেন্দু বলে ওঠে, এ নিয়ে তুই কিছু ভেবেছিস ?

হ্যাঁ ; ভেবেছি। স্পষ্ট ভাবেই জবাব দেয় পুলক, শুধু ভাবিনি, দেখে নিস সেদিন আমি কি ভাবে মুভ করি। কিন্তু মুভ করা না করাতো আসল নয় ; আসলে ভাবছি সুদীপ্ত এমন একটা কাজ করতে গেল কেন ? আমার রাগ তো ওই খানেই। কেন, আমরা বাইরে নেই, বিপদ হলে কি শুধু ওর একাই হতো ? না ও পালিয়ে গেছে বলে নিবারণ মিত্তির আমাদের ছেড়ে দিয়েছে ?

পুলক কোন জবাব না দিয়ে গুম হয়ে থাকে।

সুখেন্দু বলে, বিকাশও ভীষণ চটে আছে।

চটে আছে তো আছে। আমি কি করবো ? আমি তো আর সব ঠিকে নিয়ে বসে নেই। তোমাদের যা বক্তব্য তোমরা রাখবে। আমার যা বলার আমি বলব।

বিপিনদা গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে কোন কথা বললেন না। শঙ্কর চৌধুরী, বাণী সিংহ, পুলক, নিমাই সকলেরই একমত বিষয়টা নিয়ে বসা উচিত। বিশেষ করে অন্যান্য ক্যাডারদের কাছে এমন দৃষ্টান্ত যুক্তিহীন ছেড়ে দেওয়া যায় না।

দিগেন ভেবেছে অন্যভাবে, আপসোস মনে মনে একটা ছিল, তবু ভেবেছে এ বিষয়ে খুব সাবধানে এগুতে হবে। প্রত্যেককে ডেকেই জিনিষটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সুদীপ্তের এই ব্যাপারটা যে খুবই সাময়িক এটা প্রায় প্রত্যেককেই বোঝান দরকার। তা নইলে কমরেডদের মধ্যে যে বিক্ষোভের ঝড় দেখা দিয়েছে তা দমান যাবে না।

সুখেন্দুই যেন এ ব্যাপারে একটু বেশী গজর গজর করছে, ওর এক কথা এক্ষুণিই সুদীপ্তকে ইউনিট থেকে বের করে দেওয়া হোক।

বিকাশও যেন এ ব্যাপারে সুখেন্দুর সঙ্গে একমত। রেগে গিয়ে প্রায়ই বিকাশ সুদীপ্তকে যাচ্ছে তাই বলতো। সুদীপ্তর নরম

নরম কথাবার্তা, একটু ছিমছাম চলাফেরা। যে কোন ঘটনাকে চিবিয়ে চিবিয়ে বিচার করা অথচ মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে ওঠা সব মিলিয়ে মিশিয়ে কেমন যেন অচেনা অচেনা মনে হতো।

বিপিনদার সঙ্গে দিগেন এ ব্যাপারে আলোচনা করেছে এবং যা কিছু কথাবার্তা মোটামুটি হয়েছে, তাতে দিগেন পরিষ্কার। বিপিনদা দিগেনের উপরই ভার দিলেন তোমাকেই ডিফেণ্ড করতে হবে দরকার হলে।

দিগেন মেনে নিয়েছে। জামার হাত-গোটান অংশটা দিয়ে নাক আর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে মত দিয়েছে, ঠিক আছে আমিই ডিফেণ্ড করবো।

নির্ধারিত দিনে সুকান্ত পল্লী প্রাথমিক ইউনিট সভাটা যখন বসল তখন সবাই উপস্থিত। অসুস্থ বিপিনদাও বসেছেন। সভার শুরুটাই যেন কড়া। প্রাথমিক ইউনিটই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ঊর্ধ্বতন কমিটির পক্ষে দিগেন উপস্থিত এবং বিপিনদা নিমন্ত্রিত। স্বভাবতঃই শুরু করতে হয় প্রাথমিক ইউনিটের সদস্যদের।

পুলকই প্রথম শুরু করে—কমরেড্স অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। ঘটনাটা আপনারা সবাই জানেন। সুদীপ্তের সমস্ত কাজ কম্মোর ধারাও আমরা জানি। তার কাজে কোন আগ্রহের অভাব আছে এ কথাও মনে করি না। তবু সে শেষ মুহূর্তে যা করে বসল এটাকে মেনে নেওয়া যায় না। আপনারাও মনে করি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, প্রশ্নটা ভালবাসার নয়, প্রশ্নটা আদর্শের। ওকে আমিও কম পছন্দ করি না। বিগত দশ দশটা বছর দুজন এক সঙ্গেই একই ইউনিটে, একই মেসে, একই ফ্রণ্টে কাজ করে আসছি।

সুতরাং, সেই আমিই অভিযোগ রাখছি এবং এই অভিযোগের একটা সুসিদ্ধান্ত চাইছি।

মোটামুটি সকলেই একটা বিষয়ে একমত সুদীপ্ত নজীরটা ভাল স্থাপন করেনি এবং এটাকে ক্ষমা করা যায় না। বিশেষ করে সংশোধনবাদীরা এটার পুরো সুযোগ নিচ্ছে। নিশ্চয় শহরের পোষ্টার আপনারা দেখেছেন, ব্যাটারা পুরো শহর ছেয়ে দিয়েছে। সুখেন্দু সায় দেয়, এ সময়ে আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতি হয়েছে।

বিকাশ থেকে শুরু করে সুখেন্দু পর্যন্ত একই ভাষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোটামুটি পুলকের অভিমতটাই সমর্থন করলো। অবশ্য সকলেই আলোচনাকে আরো বিস্তৃত করল। ভালো মন্দ নানা দিকের মত প্রকাশ করলো। ঘণ্টা দুই ধরে প্রায় সকলেই আলোচনায় অংশ নিয়ে নিজেদের অভিমত রাখে।

দিগেন উঠে দাঁড়ায়, সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে একটু বলতে দিন। সভাপতি অনুমতি দিলেন। দিগেন কোন রকম ভূমিকা না করেই আরম্ভ করে, কমরেডস, আপনারা যে ভাবে আলোচনা করলেন, সত্যিই তা সুচিন্তিত। আপনাদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তি-সম্মত। আপনারা বললেন, বিষয়টা ভালবাসা, পছন্দ অপছন্দর নয়, প্রশ্নটা আদর্শের। কিন্তু বন্ধু, সাথী, আদর্শটা কি ভালবাসা বাদ দিয়ে? আদর্শকে ভালবেসেই তো আদর্শ। অবশ্য আমাদের মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলা বলে একটা কথা আছে। কিন্তু এই লৌহ-শৃঙ্খলা বলতে কি আমাদের জীবনে জড়বোধের কথাকেই বোঝান হচ্ছে? যন্ত্রের মতো সব কিছুকে দেখার কথা বলা হয়েছে? আমার কিন্তু মনে হয় তা নয়। বিপিনদা এ বিষয়ে আপনার মতটাও আমরা নিশ্চয় শুনতে পাব।

বিপিনদা কথা না বলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন।

দিগেন আবার ফিরে যায় তার বক্তব্যে, এখন দেখা যাক সুদীপ্তের ব্যাপারটা। সেটা দেখতে গিয়ে আমরা আপনাদের মতামতই

তুলে ধরছি। আপনারা সবাই স্বীকার করেছেন সুদীপ্তের ত্রুটিহীন অতীতের কথা, আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থার কথা। কিন্তু এই ব্যাপারটা একটা ভয়ানক পতন। কমরেডস্ আমি নিজে সেদিনের ভূমিকা তার দেখেছি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন এর সঙ্গে আমার জীবন রক্ষা করার ব্যাপারটাও জড়িত আছে। হ্যাঁ, দৃঢ় কণ্ঠেই আমি ঘোষণা করছি আছে। এবং সেদিন সুদীপ্তের ওই ঘটনার পরই কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা আমাদের আয়ত্বে এসে যায়। না হলে যে কোন পাল্টা বিপদ ঘটে যেতে পারতো! পারতো নাকি? তা হলে এবার বাকী ব্যাপারটা দেখা যাক। বাকী থেকে যায় তার হটাৎ এই ভাবে পালিয়ে যাওয়াটা। খবরটা শুনে আমার বোনটাও সেদিন ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। কমরেডস্, সেদিন তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে একটা কথাই বলেছিলাম, ব্যাপারটাকে একটা সাময়িক বিচ্যুতি হিসেবে দেখ্। আর যদি শেষ পর্যন্ত সুদীপ্ত নাই ফেরে তখন না হয় শেষ সিদ্ধান্তে আসা যাবে। দীপু, মানে আমার বোন, আপনারা সবাই জানেন, কমরেডস, সহজ বিশ্বাসে কিন্তু মেনে নিয়েছে।

বন্ধু, সাথী, আপনাদের কাছে ওই একই আবেদন রাখতে চাই। অন্ততঃ সাময়িক বিচ্যুতি হিসেবে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন না। একটা সুযোগ তার জন্যে রাখুন। সমস্ত জিনিষটাই শুধু লৌহ-শৃঙ্খলা, আদর্শ ইত্যাদি দিয়ে না দেখে তার অবদানের দিকটাও মনে রাখুন।

সুদীপ্ত একটা আবেগপূর্ণ বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে। কিছুক্ষণ ধরে সবাই নিশ্চুপ বসে কি সিদ্ধান্তে আসবে ঠিক করতে পারলো না। এবং বিপিনদাও যখন এই ভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে তার শেষ বক্তব্য রাখলেন, আর রাখলেন বেশ বলিষ্ঠ ভাবেই, কমরেডস্ আমি কিন্তু মানতে রাজী নই সুদীপ্ত পালিয়ে যেতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ফিরে আসবে। তার চোখ আমি দেখেছি। ধূসর ইস্পাতের মতো তার চোখ। সে চোখ কখনও শ্রমিক শ্রেণীকে

বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আপনারা দেখবেন কমরেডস, আজ হোক কাল হোক সুদীপ্ত ফিরে আসবে। তখন সুকান্ত পল্লীর ইউনিটের প্রায় সকল সদস্যের বুকগুলি অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। আসলে ওরা বাইরে যতোই চেঁচাক ভেতরে ভেতরে এমন একটা অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত নিতে অস্বস্তি অনুভব করছিল।

এর পর সবই পরিষ্কার হয়ে গেল এবং স্থির হলো সুদীপ্তের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক করা হলো, কিংশুকদের পালটা লাগাতার জবাব দিয়ে যেতে হবে। মজদুর ভাইদের সঙ্গে ঘন ঘন বসতে হবে যাতে তারা চরম বিক্ষুব্ধ না হয়ে পড়ে।

শুধু এই মহকুমা অঞ্চল নয় সারা পশ্চিম বাংলায়ই একটা দুর্দান্ত অস্থিরতা এসময়ে দেখা দিল। একদিকে বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে দেশের মানুষ তাদের বহুদিনের অর্জিত অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হলেন। তারা আহ্বান জানালেন সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যে কোন মূল্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। অন্য দিকে উগ্রপন্থী আন্দোলনের নামে আমদানী করা হলো পুরনো সন্ত্রাসবাদ। যাদবপুর, বরানগর, কাশীপুর, দমদম, খড়দহ, বেলেঘাটা অঞ্চলে শুরু হলো এলাকা দখলের লড়াই। শান্ত গ্রামাঞ্চলেও সে লড়াইকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। চললো বামপন্থী মতাবলম্বী মানুষদের পুরাদমে উচ্ছেদের কাজ। ফলে বহুলোক নতুন করে উদ্বাস্তু হলো। আবার কোথাও কোথাও দেখা দিল সক্রিয় প্রতিরোধ।

এই মহকুমা অঞ্চলে সন্ত্রাস যতোই ছড়ান হোক না কেন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ মোটেই খুশী নন। তারা চান আরও দ্রুত কাজ।

যার জন্যে গোটা প্রশাসন যন্ত্রটাই ঢেলে সাজানো হলো, কিন্তু হলোটা কি ?

নিবারণ মিত্তির সত্যিই ক্লান্ত। ওর এখন কিছুদিনের ছুটির দরকার। বাড়ীতে নিত্য অশান্তি। বিয়ে করা বৌটা যেন সব সময়েই ক্ষেপে আছে। দেখ না দেখ কেবল খ্যাক্ খ্যাক্। বাড়ীর চেয়ে বাইরেটাই অনেক সোয়াস্তি। বেশীর ভাগ সময়ই অফিসটা আঁকড়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু ওপরওয়ালারা এখানেও হুমকি ছাড়ছেন, হচ্ছেটা কি ?

হচ্ছেটা কি ? দেখো না নিজেরাই একবার ময়দানে নেবে ! তাহলেই বুঝতে পারবে হচ্ছেটা কি ? নিজের মনেই বিড় বিড় করে নিবারণ মিত্তির, এগু হাট বাষ্টার্ড, টুনু ঘোষ ; যার ওপর সবচেয়ে বেশী রিলাই করেছিলাম, আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। বেজম্মাটা দিব্বি গাছে ঝুলে পড়লে। মাস্তান, দু'দিন মুখোমুখী হয়েই আত্মহত্যা। নাই পারবি তো মাস্তানির দরকারটা কি ছিল ?

কিন্তু নিবারণ মিত্তির ছুটি চেয়ে ছুটি পেলেন না। উপরন্তু তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো নতুন উদ্যোগ নিতে।

ফলতঃ নিরাশ হয়ে আর লাভ কি ? নতুন করে সারাফতের উপরই শহরের ভারটা ছেড়ে দেওয়া হলো। আর সে সঙ্গে প্রতি পাড়াতেই গড়ে তোলা হলো ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী।

কর্তৃপক্ষকে খুশী করতেই হবে। তার জন্যে যে কোন স্তর পর্যন্ত তুমি যেতে পার। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পাল্টা প্রচারিত হয়ে গেল, যতদূর যাওয়া দরকার তাই করো পেছনে কেন্দ্র আছে। কোন ভয় তোমাদের নেই।

নিবারণ মিত্তির ঠিক করে ফেললেন, দাঁড়াও, শহরটা যদি একটা নতুন কুরুক্ষেত্র করে না ফেলতে পারি তো আমি শালা এক বাপের বাচ্চাই নই।

আর এটা করতে গিয়ে অন্ধধারে যা হবার তাই ঘটতে লাগলো।

ওয়াগনকে ওয়াগন চাল, তেল সব ভেঙ্গে পাচার হয়ে যেতে লাগল। ইয়ার্ড থেকে সোজা সুনিয়া নদীর ধার ধরে কিছু কিছু মাল চলে যেতে লাগল সীতারামপুর, নিয়ামতপুর বাজারে। কিছু কিছু মাল চলে যেতে লাগল দোমোহানী বাজারে। বাকী মালটা পথ ঘুরে ধাদকা রেলপার হয়ে শহরেই ফিরে আসতে লাগলো। শহরের লোকেরা বাতাসে ধরা বিনিপয়সার মালপত্র চড়া দামে খোলা বাজারেই পেয়ে গেল।

টুনু ঘোষ আত্মহত্যা করার পর নরেশ উকিল আর রেণু বাড়ীটা তালা বন্ধ করে দেরাদুন না কোথায় যেন চলে গেছেন। সঠিক কেউ বলতে পারে না।

মাঝে বাজার করতে যেয়ে চারুবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা। নমস্কার করতেই খোঁচা খোঁচা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন—কে? ও, চারুবাবু!

আপনাকে কিন্তু এই প্রথম বাজারে দেখলাম!

হ্যাঁ। কোন দিনই আসিনা। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া কথা। বাইরে যাচ্ছি একটু, তাই কিছু কেনা কাটা আর কি?

এর মধ্যে আসবেন বলছিলেন, কই আর এলেন নাতো?

দীর্ঘ নিশ্বাস যেন হৃদয় ভেদ করে বেরিয়ে এল, নাঃ! কই আর গেলাম? যাওয়া হল না আর কি! আপনারা সব ভালো তো?

আমাদের আর ভালো মন্দ। কোন রকমে শ্বাস বইছে! প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করছে।

ম্লান হাসেন নরেশ উকিল। বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়েই তার দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। হঠাৎই যেন বলে উঠলেন, না না চারুবাবু। আপনারাই আসলে বেঁচে আছেন। আপনারাই সুখী।

তারপর পেছনে জীবনকে লক্ষ্য করে বলে, চলে এসো। চলি চারুবাবু।

নরেশবাবু দেখতে না দেখতে বাজারের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। চারুবাবু আজও বুঝে উঠতে পারলেন না, নরেশ বাবুর কোন কথাটা অনুক্ত রয়ে গেল।

দয়াল শা ইদানিং খুশী।

এই তিনি চেয়েছিলেন। এইটাই চাই। বন্ধুবান্ধব মহলে তার আনাগোনাটা আবার বেড়ে গেছে। গত নির্বাচনে হেরে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছিলেন। বাইরে খুব একটা দেখা যেতনা। যা কলকাঠি নাড়া আড়ালে থেকেই নাড়তেন। নরেশবাবুদের সঙ্গে আড্ডাটাও ছিল লুকিয়ে ছাপিয়েই।

আবার তার মুখ দেখা যাচ্ছে। শহরের মানুষদের মুখে এক কথা, আবার ভোট তো তাই দেখা যাচ্ছে।

দয়াল শা সর্বত্রই একটা কথা জোর দিয়ে বলেন এখন, এবার ভোটে আমাকে হারায় কোন শালা। কেউ ভোট না দিলেও জিতব।

বন্ধু-বান্ধব সাধারণ মানুষ মাঝে মধ্যে অর্থ বুঝতে না পেরে হা হয়ে থাকেন। দয়াল শা প্রাণ খুলে হাসেন, দিলখোলা হাসি।

একমাত্র কিংশুক নিরঞ্জনের দল যেন এ হাসির অর্থ বোঝে।

একদিকে নামোপাড়া, নামোপাড়ার পাশেই রাজপাড়া, বাউড়ী পাড়া থেকে শুরু করে ওদিকে কষাই মহল্লা পর্যন্ত সাধারণ মানুষগুলো কেবল সব নিশ্চুপ। ওদের যেন সব বোবায় পেয়েছে। এমন কি প্রতিদিন যে একটা করে তরতাজা প্রাণ খুন হয়ে যাচ্ছে তাতেও কেউ মুখ খোলেনা। কিন্তু চোখের রঙ যেন বড্ড বেশী ঘোলাটে।

ব্যস্ত শুধু আঞ্চলিক অফিসটা আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক ইউনিটগুলো। প্রায় প্রতিদিনই তাদের প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে। প্রতিবাদটা জানাচ্ছে কখনও সরকারী অফিসে, কখনও কাগজের অফিসে, কখনও বা দিল্লীতে।

আরও বেশী ব্যস্ত নতুন ইহুদীদের নিয়ে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে আঞ্চলিক অফিসে এসে তারা জমায়েত হয়ে আশ্রয় চাইছেন, আমরা এলাকায় কিছুতেই ঢুকতে পারছি না। যা হোক ব্যবস্থা করুন।

ভার প্রাপ্ত দিগেন অমনি আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে, বলে একটু অপেক্ষা করুন, আগে যারা এসে পৌঁছেছেন তাদের ব্যবস্থাটা করে দি। ততক্ষণে কিচেনে নামটা নোট করিয়ে দিয়ে আসুন, নয়তো আপনাদের রান্না হবে না।

কাউকে বা বলে, দেখছি আপনাদের জন্যে ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কজন বললেন, জনা দশেক দিলেই এলাকায় ফিরে যেতে পারবেন ? বেশ, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই ভাবে গভীর রাত পর্যন্ত তাকে খাটতে হয়। দিগেন কোন ক্লান্তি, কোন অসুবিধেই অনুভব করেনা। এক একটা সমস্যা সমাধান করার পরই আবার নতুন উদ্যোগ নিয়ে আরেকটা ধরে। কোনো সমস্যাটাই তার কাছে সমস্যা নয়।

বাণী সিংহও সঙ্গে থাকেন। বিপিনদা অসুস্থ হয়ে বড়দাদের বাড়ী চলে যাওয়ার পরই কাজের চাপটা শঙ্কর চৌধুরী আর দিগেনের উপর অনেক বেশী পড়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় অলিখিত ভাবেই বুঝি আঞ্চলিক দপ্তরের ভারটা দিগেনের হাতে এসে গেছে।

বাণী সিংহও অনেক রাত পর্যন্ত দিগেনের পাশে থেকে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য দিয়ে যায়। তারপর ক্লান্ত দেহটা বয়ে নিয়ে গিয়ে মহিলা সমিতির অফিসে কোন রকমে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেয়। কারণ কিচেনের পুরো চার্জটাই আসলে ওর হাতে।

বাণী সিংহের পক্ষেও এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সুখের হয়েছে। কারণ বাড়ী ফিরে যাওয়ার পিছুটান আর নেই।

ঘটনাটা ঘটেছিল দিন পনের আগে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর প্রায় মধ্যরাত্রে গোপন মিটিংটা সেরে যখন নিউটাউনে তাদের

নিজেদের পুরনো বাড়ীটায় ফিরে এসেছে, তখন সে ভয়ানক ক্লান্ত। এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছিল কেউ ঠেলে দিলে এক্ষুণি পড়ে যাবে।

বার কয়েক কড়াটা নাড়লো বাণী। কিন্তু তবু সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে আবার কড়া নাড়লো। এবার বেশ জোরে এবং এক-টানা অনেকক্ষণ ধরে।

বৌদিই উঠে এলেন, কি ব্যাপার এত হৈচৈ করার কি হলো? রোজ রোজ তোমার জন্যে এত রাত পর্যন্ত কে জেগে থাকবে? বাইরে আড্ডা মারলে একটু ধৈর্য ধরতে হয়।

একে বাণী ক্লান্ত হয়েই ছিল। তার ওপর এই ভাষাটা তাকে মারাত্মক আঘাত হানলো। কিন্তু কোন কথা বললেনা সে। কপাল কুঁচকে বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই বলে, তোমাদের অসুবিধেটা আমি বুঝি বৌদি! তোমরা কি চাও তাও জানি। আমাকে আজ রাতটা একটু ঘুমুতে দাও।

বৌদিকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল।

পরদিন সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠবার আগেই বেরিয়ে এসেছিল নিজের টুকি-টাকি দু একটা জিনিস নিয়ে। মনস্থির করে ফেললে বাণী, আপাতত মহিলা সমিতির অফিসটা তো ব্যবহার করা যাক। তারপর দেখা যাবে। সেই থেকে ওখানেই আছে।

আঞ্চলিক দপ্তরে ঠাসবুননি কর্মসূচীর ফাঁকে ফোকড়েই শঙ্করদা কিংবা বাণী সিংহ গভীর রাতে নামোপাড়ায় বিপিনদার সঙ্গে দেখা করে যান।

বিপিনদার শরীরটা যেন এর মধ্যে অনেক বেশী কাহিল হয়ে পড়েছে।

অবশ্য বড়দা কোন ত্রুটি রাখেন নি। সেবা শুশ্রূষার ভারটা

নিজের হাতেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিক্ষণের অতন্ত্র প্রহরী।

বিপিনদা একা থাকলেই বেশী চিন্তা করেন। ডাক্তারের যা একান্ত বারণ। বড়দা নানান ভাবে বিপিনদাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে, যাতে চিন্তা না করে ঘুমুতে পারেন।

কিন্তু বিপিনদার চোখে সত্যিই ঘুম নেই। সময়ে সময়ে আপসোস করেন, আর বোধ হয় হলনা কমরেড। আর বোধ হয় বেশীদিন টেনে নিয়ে যেতে পারব না।

বড়দা শান্ত বিনম্র ধমকে বলেন, আপনি আবার ভাবতে শুরু করেছেন? ডাক্তার আপনাকে কত করে মানা করেছে। আপনি না ভেবে একটু ঘুমুন তো।

বিপিনদা বুঝি ভেতরে ভেতরে হেসে ওঠেন, আপনারা আমায় ভালবাসেন, আপনারা নিশ্চয় আমাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সত্যিই যেন ভেতরের সেই তাগিদটা কমে আসছে।

আপনি আবার শুরু করলেন। তাহলে আমি সব কমরেডদের আবার জড়ো করব।

—না না আপনি তা করবেন না। ওদের অনেক কাজ। এই আমি চুপ করলুম। এবার খুশী তো।

বড়দা কোন কথা না বলে ওষুধের গ্লাসটা এগিয়ে দেন।

নিশব্দে বিপিনদা হাতে তুলে নেন। কিছুক্ষণ হাতে ধরে থেকে বলে ওঠেন, শেষ লড়াইটা মনে হচ্ছে দেখে যেতে পারলাম না। তারপর গলার ভেতর ঢেলে দেন ওষুধটা। মুখটা বিকৃত করে বলেন, ভয়ানক তেতো!

বড়দার হাসি পেয়ে যায়। যেন একেবারে ছেলে মানুষ। তোয়ালেটা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দেন। বিপিনদার অসহায় মুখটা দেখে অপার করুণায় ভরে ওঠে বড়দার মনটা। নিজের অলক্ষ্যেই একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে আসে হৃদয় ভেদ করে। এই এবড়ো-

খেবড়ো চোয়াল ওঠা খুদে পঙ্গু মানুষটাই এক কালে ব্রীটিশ সরকারের কাছে ছিলেন চূড়ান্ত সন্ত্রাস। আজও একটা স্বাধীন সরকারের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন শুধু লাখো মানুষের ভালবাসার মূলধন নিয়ে।

এবং এই আসল সত্যটা শেষ পর্যন্ত এরাও আবিষ্কার করে বসলো। শুধু আবিষ্কারই করলো না চূড়ান্ত রূপ দিতেও বদ্ধ পরিকর হল।

পরিকল্পনাটা শুধু নান্নু দারোগা আর নিবারণ মিত্তিরের নয়। জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসকের সঙ্গে ছিল গুপ্তচর বিভাগের খবর। কিছুতেই পারা যায় না এলাকাটা বাগাতে, যদি না বিপিন বাবুর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

স্বভাবতই সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলতে তারা আর দেরী করেনা। সেই সঙ্গে জেলা শাসক পরিষ্কার জানিয়ে দেন, এর পর আর কোন অজুহাত শুনবনা।

নান্নু দারোগা আর নিবারণ মিত্তির দুজনেই আশ্বাস দেয়, এবার একবার দেখুন না।

কিন্তু এই হয়। বুর্জোয়া আমলাদের ভুল পদক্ষেপই আসলে তাদের কবর খোঁড়ার পথকে প্রশস্ত করে দেয় নিজেদের অলক্ষ্যেই। এবং এদের এই ভুল চিন্তাটাও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে অন্যতম হাতিয়ার।

প্রায় ঝড়ের বেগে কাকডাকা ভোরের আগেই সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। বিপিনদা গ্রেপ্তার। মিশায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অসুস্থ বিপিনদাকে। পিল পিল করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো অগুণতি

মানুষ। এল. আই. সি., কেরু, অক্সিজেন, কাঠগোলায় খবর পৌঁছে গেল বিপিনদা গ্রেপ্তার। পৌঁছে গেল ব্যাঙ্ক মিউনিসিপ্যাল হকার্স ইউনিয়নেও "বিপিনদা গ্রেপ্তার। চলো জোড়তল।"

খবর এলো রেল. আই. জি. আই. কোলফিল্ড ওয়ার্কাস ইউনিয়নে বিপিনদা গ্রেপ্তার।

সারা শহরটায় তখন একটিই মাত্র সংবাদ "বিপিনদা গ্রেপ্তার।" একটিই মাত্র আওয়াজ "চলো জোড়তল।"

খবর গেল বার্ণে, শিক্ষক সমিতিগুলিতে, খবর পৌঁছে গেল এলাকা থেকে এলাকায় নামোপাড়া রাজপাড়া ওপরপাড়া সুকান্ত পল্লী ঝিঙরী মহল্লা থেকে শুরু করে খাদকা রেলপার মোশলে, গাঙ্গুলী পাড়া ঠাকুর পাড়ার অলিতে গলিতে খবর শুধুই একটা "বিপিনদা গ্রেপ্তার। চলো জোড়তল।"

মানুষ আর মানুষ। মানুষের চাপে প্রায় রাস্তাগুলিই যেন এক একটি মিছিল।

বাণী সিংহ, শঙ্করদা, দিগেন, পুলক, নিমাই আঞ্চলিক অফিস থেকে রওনা হয়ে জোড়তলে যখন এসে পৌঁছল তখন সেখানে লাখো মানুষের বিক্ষুব্ধ গর্জন, "বিপিনদার মুক্তি চাই। সমস্ত সন্ত্রাস রুখতে হবে।"

আঞ্চলিক অফিসে গ্রেপ্তারের সংবাদটা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত সবাই প্রথমে হতবাক হয়ে পড়ে। বিমর্ষ চাপ চাপ দম আঁটা একটা নিস্তব্ধতা সারা দপ্তরটার মানুষগুলোকে যেন চেপে মারতে থাকে। কেউই কোন কথা বলতে পারলে না। মাথা হাঁটুতে গুঁজে অসহায়ের মতো বসে পড়ে। শঙ্কর চৌধুরী অর্থহীন ভাবে মুষড়ে পড়া কমরেডদের প্রতি চোখ বোলালেন।

বাণী সিংহের চোখে কি জল? নীরবে চোখে কাপড় দিয়ে মুখ লুকালো ও।

দিগেন তার বলিষ্ঠ মুঠিটা আক্রোশে মেঝের উপরই বার কয়েক ঠুকে নিল। পুলক, নিমাই, বিকাশের চোখে আগুনের ফুলকি!

শঙ্কর চৌধুরী ইতস্তত: ভাবে এর ওর দিকে আবার তাকালেন, তারপর এক সময়ে বললেন, কি হলো কমরেডস, সবাই যদি আমরা এভাবে বসে থাকি তাহলেই চলবে? যা হোক একটা কিছুতো করতেই হবে।

পুলক আনমনা ভাবেই যেন বলে ওঠে, কি আর করব? আপনিই বলুন এরপর কি আমাদের করার আছে? বেশীর ভাগ কলকারখানা বন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় হামলা। স্কুল কলেজ বন্ধ। আমরা কেউ এলাকায় ফিরতে পারছিনা। শেষ ভরসা বিপিনদাও গ্রেপ্তার। এবার আমাদের নেতৃত্ব দেবেন কে? কি আমরা করব?

শঙ্করদা ভাবছেন কি জবাব দেবেন! বাকী সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্করদার দিকে তাকিয়ে।

হটাৎ দিগেন একেবারে সটান হয়ে দাঁড়ায়। এতক্ষণ বুঝি তার ভেতরটায় কি একটা অব্যক্ত ভাব বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছিল। যেমন ভাবে বীজের অঙ্কুর জল পেয়ে ধীরে ধীরে মাটি ভেদ করে শিরদাঁড়াটা সোজা করে সূর্যের মুখকে চ্যালেঞ্জ জানায় ঠিক সেই ভাবেই যেন দিগেনের ভেতর দিয়ে তীব্র চেতনায় বেরিয়ে এলো কথাগুলি।

দৃঢ় মুষ্টি দিগেন তখন এক নাগাড়ে বলে চলেছে, সত্যিই কি কমরেডস আমাদের কিছুই করণীয় নেই? এত বড় মারাত্মক ঘটনাটা একেবারে বিনা প্রতিবাদেই যেতে দিতে হবে? আমাদের সবচেয়ে প্রিয় নেতা, আমাদের চোখের মণি, আমাদের পথ-নির্দেশক, শিক্ষক বিনা বিচারে আটক। আর আমাদের কিছুই করণীয় নেই? এতই অসহায় আমরা? কল কারখানা বন্ধ তা সত্যি, পাড়ায় ঢুকতে পারছিনা তাও সত্যি! কিন্তু মানুষ, সাধারণ মানুষ কি শেষ হয়ে

গেছে ? সাধারণ মানুষ কি আমাদের ছুঁড়ে দিয়েছে ? না, কমরেডস করার আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি সাধারণ মানুষ আমাদের দিকে। তাই এক্ষুণি বেড়িয়ে পড়তে হবে। হ্যাঁ, সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই বেরুতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে কাল সারা মহকুমা অঞ্চল বন্ধ। আমাদের প্রিয় নেতার মুক্তি আমরা চাই। প্রয়োজন হলে অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলবে এই বন্ধ। যানবাহন রাস্তায় বেরুবে না। দোকান পাট খুলবে না। কল কারখানা, অফিস সব অচল করে দিতে হবে। মনে রাখবেন কামরেডস্, এটা আমাদের করতেই হবে। এবং করতে হবে আমাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করতে। করতে হবে সন্ত্রাসবাদকে রুখতে। করতে হবে আগামী দিনের লড়াইকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। তার আগে এক্ষুণি জমায়েতের আহ্বান ছড়িয়ে দিন। সকলকে জমায়েত হতে হবে নামোপাড়ায় জোড়-তলে। মনে রাখবেন জয় আমাদের ছিনিয়ে আনতেই হবে।

কখন যেন দিগেন নিজেই নির্দেশ দিতে শুরু করে। সম্ভবতঃ এই ভাবেই শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে যায় !

এই সেই জোড়তল আবার লাখো মানুষের পদভারে কেঁপে উঠলো। এই সেই জোড়তল একদিন যেখান থেকে শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এই সেই জোড়তল যেখান থেকে শ্রমিক শ্রেণী একদিন তার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে। যেখানে একদিন বল্লভভাই প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। যেখানে কবি সুধীন দত্ত বক্তৃতা করেছেন। যেখানে জ্যোতি বসু দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধিক্কার ঘোষণা করেছিলেন খাদ্য আন্দোলনের শত শহীদের নামে শপথ নিয়ে।.........

জোড়তল চলো আহ্বানে তখন নামোপাড়ায়ও সাড়া পড়েছে। ছেলে-বৌ, বুড়ো-বুড়ি, ছেলেমেয়ে যে যেখানে ছিল বেড়িয়ে পড়েছে জোড়তলের উদ্দেশ্যে। শুধু সুনন্দা শ্বশুরকে ছেড়ে যেতে পারেননি। বুড়ো শ্বশুর খাটিয়ার উপর হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে নিজের মনেই বিড় বিড় করছিলেন। সুনন্দা পাশেই গালে হাত দিয়ে ঠায় বসা। দীপু, চারুবাবু জোড়তলে গেলেও শ্বশুরকে ফেলে সুনন্দা যান কেমন করে? অথচ কত দিন দেখেন নি ছেলেকে! চারুবাবু অবশ্য আশ্বাস দিয়ে গ্যাছেন, দেখা করবেন ছেলের সঙ্গে, সম্ভব হলে কিছুক্ষণের জন্যেও যদি আসতে পারে।

শিবুতো সেই সাত সকালেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে। ওকে রেখে ও যে একবারের জন্যে যাবেন, তাও হবার নয়।

বসে থেকে থেকে সুনন্দা ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা উদ্বেগ বোধ করছেন। কেমন একটা বোবা কান্নার ছটফটানি। এরই মধ্যে কয়েকবার এঘর ওঘরও করলেন, তুলসী মঞ্চে দাঁড়ালেন, দরজার বাইরে উঁকিঝুঁকি মারলেন। শেষপর্যন্ত আবার শ্বশুরের খাটিয়াটার একপাশে বসে পড়লেন।

আনন্দবাবু হাঁটু থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন, ওরাএলো মা?

—না।

—দিগা এলো?

—না।

—ও আর আসবে না?

—বলতে পারছিনে বাবা।

—ছেলেটা এমন হয়ে গেল কেন মা? ওতো অমন ছিল না।

হ্যাঁ বাবা ও অমন ছিলনা। যতোদিন ও আমাদের ছিল, ততোদিন অমন ছিলনা। এখন তো আর আমাদের নয়, সকলের।

—কার?

—সবার ! সব মানুষের। বলতে বলতে ভেতরের কান্নাটা আর চেপে রাখতে পারলেন না সুনন্দা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। আনন্দবাবু কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বিব্রতভাবে কয়েকবার মাথার উপর হাত বুলাতে বুলাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। প্রচণ্ড হাহাকারে সেই দীর্ঘ নিশ্বাস বুঝি বাড়ীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত গুমরে মরে।

অথচ সুনন্দা কাঁদতে চাননি। সুনন্দা কাঁদতে চাননা। সুনন্দা কি বোঝেন না এখনও ওদের অনেক কাজ বাকী। তাঁর ছেলে শুধু তাদের সংসার দেখবার জন্যেই জন্মায় নি। অনেক সংসারই ওদের মুখ চেয়ে বসে আছে। আশায় বুক বাঁধছে। আজ না হোক, আগামী কাল সুদিনের মুখ দেখতে পাবে তারা।

এত বোঝা সত্বেও স্নেহান্ধ মন তাঁর। সুনন্দা মা। মায়ের মন কোন যুক্তিই মেনে নিতে সায় দেয়না। দিগেনের না খাওয়া, না শোওয়া, বিরাম বিশ্রামহীন শুকনো মুখ সর্বদাই তাকে খুঁচিয়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তাঁরও রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। কতদিন সুনন্দা স্বামীর কাছে এই রকম বিনিদ্র রাতে অভিযোগ করেছেন, শেষ পর্যন্ত ছেলে আমার গোছানো সংসারটা ছারখার করে দিলে ? ওকি পাষণ্ড না আর কিছু ?

গম্ভীর চারুবাবু ম্লান হেসেছেন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিয়েছেন, ওরকম বলোনা বড়বৌ, ওরকম বলোনা। ওরা কারো সংসার ছারখার করতে পারেনা। সংসার ভাঙা ওদের কাজ নয়। সংসার জোড়া লাগানোই তাদের কাজ। মানুষের সংসারে হাসি ফোটানই ওদের ধর্ম। বলতে পারো ক'জন পারে সব ছেড়েছুড়ে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ? আমি পেরেছি, না তুমি পেরেছ ? কেউ পারিনি। যারা পেরেছে তাদের কাছে আমাদের ঋণ অনেক।

কিন্তু আমি তো মা, না কি ?

সেটাই তো তোমার গর্ব। দিগেন তোমার ছেলে। আমার ছেলে। আমরা যা পারিনি সে তাই করছে। শুধু ছোট একটা সংসারে তাকে আটকে রেখে কি করবে? ওর জন্মে দুঃখ করোনা।

সুনন্দা অনেক কষ্টে, অনেক দুঃখে মেনে নিয়েছেন সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত। অমঙ্গল অশ্রু নীরবে মুছেছেন। গভীর রাতের সেসব কথা অন্য কারো কাছে অনুক্তই রয়ে গেছে। একদিকে নিজের আপন সংসার, অন্যদিকে সবার। এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সুনন্দার মন শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়েছে। নিজের স্বার্থটাই আর বড় হয়ে উঠতে পারেনি।

তবু আজ যেন একটিবার দেখবার জন্যে মন তার ভয়ানক ভাবে উতলা হয়ে ওঠে: এত কাছে এসেও একবার চোখের দেখাটি দেখতে পাবেনা? তাই বুঝি এত অন্তর্দাহ। মন বুঝি তাঁর আবার স্বার্থপর হয়ে উঠতে চায়!

না, সুনন্দা কোন দুর্বলতাকেই আর প্রশ্রয় দেবেন না আজ। হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। মন থেকে সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিয়ে সতেজ হয়ে ওঠেন। ফেলেরাখা ঘরের কাজে লেগে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদেই ফিরে আসে চারুবাবু আর দীপু। শিবু ফেরেনি। শব্দ পেয়ে রান্না ঘর থেকে ছুটে আসেন সুনন্দা।

আনন্দবাবু খাটিয়ায় বসেই মুখ তুলেন, কে, দিগা এলি?

দীপুই প্রথম ঢোকে, না দাদু, দাদা আসেনি!

ক্ষণ উদ্ভাসিত মুখ সুনন্দার মুহূর্ত মধ্যেই ম্লান হয়ে আসে। চৌকাঠ আঁকড়ে জিজ্ঞেস করেন, আসতে পারলোনা বোধ হয়? দাদুর কথা বলেছিলি?

বলবো কখন? সে কি প্রচণ্ড ভীড় মা। কাছে এগুবার কোন উপায়ই নেই। থিকথিক করছে। কেবল মানুষের মাথা। কেবল মানুষ আর মানুষ। শ্লোগান আর শ্লোগান।

চারুবাবু দাওয়ায় এসে বসেন, নিজের মনেই বলেন, অতো ভিড়ে সত্যিই কিছু বলা যায়না।

দীপু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, জানো মা, দাদা না, কি সুন্দর বক্তৃতা দিলে! মুখে যেন খৈ ফুটছে। তুমি তো বিপিনদার বক্তৃতা শুনেছ, ঠিক সেই রকম। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বললে। চোখ, মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল রাগে ঘেন্নায়। হাত নেড়ে নেড়ে সেকি বক্তৃতা! উফ, তুমি যদি দেখতে।

—ও আছে এখন, আমি একবার যাবো?

—কোথায় যাবে মা? এখনও কি রয়েছে? থাকলে কি আমরাই চলে আসতাম নাকি? দল বেঁধে, কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে এ. ডি. এম.-এর বাংলোর দিকে। সভায় ঠিক হয়েছে বাংলো ঘেরাও করে বসে থাকবে, যতক্ষণ না বিপিনদাকে ছাড়ছে ততক্ষণ।

চারুবাবুও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, সত্যিই ছেলেগুলি পারেও। এখান থেকে আবার ছুটেছে। তোমার শিবুও গেছে। ওকেও আর আটকাতে পারবে না।

সুনন্দা কোন কথাই বললেন না। যেমন ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এক সময় জাফরি-কাটা জানালার কাছে সরে এলেন, বুঝি এইমাত্র চোখে যে অমঙ্গল অশ্রু নেমে এসেছিল তাকে ঢাকতেই। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলেন সুনন্দা। সামনের দিকে তাকালেন। জাফরিকাটা জানালার ফাঁকে স্পষ্ট আকাশ। নির্মল, নির্মেঘ।

না, কাঁদবেন না তিনি। ওদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক। তারা এগিয়ে যাচ্ছে যাক। শুধু চোখের জলে তিনি তাদের পিছু টানবেন না। সুনন্দা মা, দূর থেকেই তিনি আশীর্বাদ করছেন, ঝড়ঝঞ্ঝা, উপেক্ষা করে দুর্দম বেগে শেষ জয়ের জন্যে তোরা এগিয়ে যা। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করেই তোরা এগিয়ে যা। আমি মা হিসেবেই ঘোষণা দিচ্ছি, জয় তোদের অনিবার্য।